শিশু সাহিত্যে পত্রিকা

বাঁশি খাতা

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

বিষয় : গ্রাম জীবন

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলি

খাতা পৌষ ১৪২৩

প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকের কথা

গদ্য ও গল্প
বিপ্লব মাজী, অর্ক চৌধুরী, শুভঙ্কর গুহ, রাহুল দাশগুপ্ত
তৃষ্ণা বসাক, তন্বী হালদার, অভিজিৎ শীল

কবিতা
গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসব দাশগুপ্ত, সুদীপ দাশ,
স্বাতী গুপ্ত, সমীরণ কুন্ডু, চয়ঞ্জীব শূর

চিত্রকলা
কৃষ্ণপদ পাল, পার্থপ্রতিম তালুকদার, পিঙ্কি ঘোষ
শৈলেশ চ্যাটার্জী, সায়ন সামুই, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, সুমন বর্মণ

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলি

খাতা পৌষ ১৪২৩

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকের কথা

গদ্য ও গল্প

বিপ্লব মাজী, অর্ক চৌধুরী, শুভঙ্কর গুহ, রাহুল দাশগুপ্ত
তৃষ্ণা বসাক, তন্বী হালদার, অভিজিৎ শীল

কবিতা

গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসব দাশগুপ্ত, সুদীপ দাশ,
স্বাতী গুপ্ত, সমীরণ কুন্ডু, চয়ঞ্জীব শূর

চিত্রকলা

কৃষ্ণপদ পাল, পার্থপ্রতিম তালুকদার, পিঙ্কি ঘোষ
শৈলেশ চ্যাটার্জী, সায়ন সামুই, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, সুমন বর্মণ

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলিখাতা

সম্পাদক
বিজয় দাস

যুগ্ম সহ-সম্পাদক
ঋষভ চৌধুরী, সুদীপ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
অভিজিৎ শীল

অলংকরণ
সুদীপ চক্রবর্তী
অভিজিৎ শীল

যোগাযোগ
৩/৩৩/১, সারদা ব্যানার্জী রোড, চরকতলা, কলকাতা-৭০০১১১
চলভাষ ঃ ৯৮৩০৩১৯৩৮৯
Email : kolikhata@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস ঃ সিদ্ধার্থ দে (৯৮৩৬০৩৬১৩৩)

মুদ্রণ ঃ জয়গুরু উদ্যোগ, ৫৯, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

পরবর্তী সংখ্যা ঃ ডাস্টবিন

প্রাপ্তিস্থান
কলেজ স্ট্রীট ঃ পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু
রেলওয়ে বুক স্টল ঃ দমদম, বিরাটী, বেলঘরিয়া
এছাড়াও ৯৮৩০৩১৯৩৮৯, ৮৯৬১২১৮৮৯১

সম্পাদকের কথা

ভারতের গ্রাম প্রকৃত ভারতের আত্মা। শহর শিল্প, সাহিত্য, নির্মাণকলার কেন্দ্র হলেও আমাদের কল্পনার জগতে বরাবর গ্রামের প্রাধান্য। কখনও অস্তমিত সূর্যের আলোয় সোনার ফসলে ভরা ক্ষেত অথবা নদী স্রোতে কোনও মাঝির ভাটিয়ালি গান। তাই শহরকেন্দ্রিক হয়েও আমাদের শিকড় ছুটে চলে ধান ক্ষেত ধরে। সাঁতরে বেড়ায় নদীর জলে, আবার কখনও ঝোড়ো হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় নিজেদের। গ্রাম মানেই আমরা ভাবি কৃষিভিত্তিক মানুষের ছোট একটি জনবসতি। বর্তমানে ভারতের ৬৮.৪৮ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করেন। সুতরাং ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাও গ্রাম নির্ভর।

প্রায় খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভুসুকপাদ লিখছেন—"বাজণাব পাড়া পঁউআ খাঁলে বাহিউ / অদঅ দঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।। / আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী / নিঅ ঘরিনী চণ্ডালে লেলী।" আবার কখনও কাহ্নপাদ গ্রাম্য সরল প্রেমের উপর লিখলেন—"ভবনির্বাণে পড়হ-মাদলা / মন বপন বেণি করণ্ডকশালা।। / জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিঅঁ / কাহ্ন ডোম্বি-বিবাহে অলিঅ।।" সেই চর্যাপদের সময় থেকে বর্তমান সময়েও বাংলা তথা ভারতের গ্রাম শিল্পী-সাহিত্যিকদের সাধনার বিষয়। গ্রাম কখনও রমণী, কখনও সবুজ, কখনও অভুক্ত জোয়ান, কখনও সোনার ফসল। কখনও প্রাক-ঐতিহাসিক গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা থেকে বর্তমান পরিস্থিতি, কখনও আত্মভোলা সহজ সরল যুগলপ্রসাদ, আবার কখনও বেদে গ্রামের সামাজিক পটভূমি।

ভারত গ্রামভিত্তিক দেশ হলেও আজও ভারতের গ্রামব্যবস্থা অনগ্রসর। শহর যত দ্রুত গতিতে চলছে উন্নতির শিখরে, সেখানে গ্রাম চলেছে হামাগুঁড়ি দিয়ে। তাই আমরাও হামাগুঁড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছি আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। প্রত্যেকের সাহায্যে ও সহযোগিতায় আমরা কৃতার্থ। প্রতিটি পদক্ষেপে আরও বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠায় আমরা কর্মরত। সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে "কলিখাতা"-র দ্বিতীয় সংখ্যা 'ভারতের গ্রাম ও গ্রামজীবন'।

ভারতবর্ষের গ্রাম

বিপ্লব মাজী

আদিম মানবের পরিচয় ও জীবনযাত্রার একটু সন্ধান নিলে আমরা বুঝতে পারব পৃথিবীতে প্রথম কিভাবে গ্রাম জন্ম নিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন আজ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব। কিন্তু সে মানুষ আকৃতিতে অনেকটা বানর জাতীয় জীবের মতো ছিল। এখনকার মানুষের সঙ্গে তাদের অনেক পার্থক্য ছিল। একরকম বিশাল আকৃতির পশুই তারা ছিল। সভ্যতার পথে সেই মানুষ একটু এগোল যখন সে হাতের বদলে পাথরের ব্যবহার শিখল। পাথরকে ধারাল করে হাতে তৈরি পাথরের অস্ত্রই হল তার হাতিয়ার। আর এই পাথরের অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ পশুদের থেকে আলাদ হয়ে গেল। নানারকম ফলমূল, পাখির ডিম আর মাছ ছিল মানুষের খাবার। এইসব সংগ্রহ করা ও পশু শিকার ছিল মানুষের প্রতিদিনের কাজ। এরপর মানুষের যুগান্তকারী আবিষ্কার হল গাছের গুঁড়ি কেটে চাকা। চাকা আবিষ্কারের পর মানুষের আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার আগুন। চাকা ও আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করতে না পারলে মানুষ আদিম মানবই থেকে যেত। মানব সভ্যতা পাথরযুগেই পড়ে থাকত। আদিম সেই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে মানুষের একার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। দলবেঁধে তারা বসবাস করতে লাগল। যদিও কেউ কারো ভাষা বুঝত না। পিথেকান্-থ্রোপুসদের আমরা বলি পৃথিবীর আদিম মানব। অর্থাৎ বানর-মানুষ। আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেকতুস অর্থাৎ সোজা মেরুদন্ড মানুষের আবির্ভাব হল। প্রতিদিনের কাজের হাতিয়ারের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ একটু একটু সভ্যতার দিকে এগোচ্ছিল। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় আর যেখানেই খাবার-দাবার পায় থিতু হয়ে ক'দিন থাকে। ফলমূল, শিকার না মিললে অনাহার। প্রথমে মানুষ বাস করত স্যাঁত স্যাঁতে অন্ধকার গুহার ভেতরে। দেখতে দেখতে গাছপালার ডাল, পশুর হাড়গোড় ও চামড়া দিয়ে মানুষ কুঁড়েঘর বানাতে শিখল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন আজ থেকে প্রায় ত্রিশহাজার বছর আগেও বাঁচার তাগিদে মানুষ এক একটি দলে বাস করতে শুরু করে, আর তা থেকে দেখা দেয় ঘনিষ্ঠতা। মানব সভ্যতায় গোত্র ভিত্তিক গোষ্ঠী দেখা দিল। একই পূর্বপুরুষের বংশধর তারা, পরস্পরের আত্মীয় বা জ্ঞাতি। ক্রমে গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকেরা হলেন দলপতি। এই মানুষরা যৌধ সম্পত্তি ভোগ করত। সবকিছুতেই মালিকানা ছিল সবার। কোন বৈষম্য ছিল না। পৃথিবীতে দেখা দিল আদিম গোষ্ঠী সমাজ। যারা এক এক স্থানে কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করে। দেখতে দেখতে পাশাপাশি অনেকগুলি কুঁড়েঘর নিয়ে পৃথিবীতে দেখা দিল গ্রাম। গ্রাম জন্ম নিল। গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেছে একটা প্রধান রাস্তা বা নদী। নদী বা রাস্তার দুধারে লাইনবন্দী কুঁড়েঘর। পাশেই অরণ্য। যেখান থেকে আসবে ফলমূল ও শিকারের পশু; নদীতে পাওয়া যাবে মাছ। সভ্যতা অনেকটা এগিয়ে গেল। মানুষ শিখল চাষবাস। ফলে তার যাযাবর জীবন ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে গেল। মানুষ গ্রামে বাস করে। একটা গ্রামের পাশে আরেকটা গ্রাম, আরো একটা। এক এক গোষ্ঠীর এক একটা গ্রাম। ক্রমে গোষ্ঠীর সর্দাররা ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠল। গ্রামের মধ্যে হল তার বাসস্থান। অন্যেরা তাকে কেন্দ্র করে কুঁড়েঘর বানাল। প্রতিটি কুঁড়েঘরে এক একটি পরিবার। পরিবার জন্ম নেওয়ায় মানুষ

যেমন সভ্যতার আলোর পথে কয়েকধাপ এগিয়ে গেল, যুথবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। সমাজে শ্রমবিভাজন যেমন দেখা দিল শ্রেণী বিন্যাসও দেখা দিল। পরবর্তীকালে ভারতের মতো দেশগুলিতে বর্ণপ্রথা বা জাতপাতের উঁচুনিচু শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল। যদিও সেই জাতপাত বিন্যাস আধুনিক কালের মতো অমানবিক ছিল না। থাক সে কথা, আমাদের আলোচনার বিষয় গ্রাম। আজ থেকে ৬-৭ হাজার বছর আগে গ্রামের চেহারা যেমন ছিল, এই উত্তর আধুনিক একুশ শতকেও গ্রামের চোহারা প্রায় একই রকম আছে। শুধু বাড়িঘর পথঘাটের চেহারা বদলেছে। কিন্তু গ্রাম বলতে ৭০০০ বছর আগে মানুষের মনে যে ছবি ভেসে উঠত, আজও প্রায় সেই একই ছবি। গ্রাম মানেই কিছু ঘর, পুকুর ডোবা, বাগান, চাষবাসের জমি, পাশ দিয়ে বা মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে কোন নদী বা খাল। একসময় প্রতিটি গ্রামই তার প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করত। পরে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম থেকেই জন্ম নেবে নগর এবং নগররাষ্ট্র আর মানুষের জীবনে রাজনীতি ও অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটবে।

২

যীশুর জন্মের ১২০০ থেকে ৯০০ বছর আগে ভারতীয় গ্রামের একটা ছবি আমরা ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে পাই। গ্রামীন জীবন নানাভাবেই বিপদসংকুল যেমন, তেমনি নানা বিস্ময়ে ভরা। অধিকাংশ গ্রামই তখন অরণ্যঘেরা। যে অরণ্যে হ্রিংস প্রাণক্ষয় ছাড়াও, নানাজাতের সাপ ভরা। প্রতিকূল পরিবেশ। আদিম প্রকৃতি। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ অন্ধকার দুর্ভেদ্য অরণ্যে বন্যপশুর ভয়ে মানুষ প্রবেশ করতে পারত না। মানুষ প্রকৃতিকেও মনে করত তারই মত সজীব। আদিম প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে নানা অপঘাতের কালো পর্দা। তবু মানুষ আগুনের ব্যবহার জেনে নিজের নিরাপত্তা ও আত্মপ্রত্যয় অনেক সুনিশ্চিত করতে পেরেছিল। আগুনের সাহায্যে প্রথম যজ্ঞ শুরু করে এবং যজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিকূল প্রকৃতিতে জয় করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

ঋগ্বেদের সময় গ্রামের মানুষের সাজপোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, খাবার-দাবার, ভোজ্য পানীয়ের রথ ও বিভিন্ন বাহনের যে বর্ণনা আমরা পাই তা থেকে বোঝা যায় ঐ সময়ের মানুষ পশুধন, স্বর্ণ, স্বাস্থ্য, শস্য, সন্তান, রোগমুক্তির মত বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। দীর্ঘ জীবন কামনা করত। জীবনকে নিরাপদ ও চিরায়ত করতে চাইত। যদিও কোন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু মানুষ চাইত অনির শেষ জীবনের সুখ ভোগ করতে। অর্থাৎ মানুষ ছিল জীবনমুখি। আকাশ, সূর্য, ঝড়-বৃষ্টি, অরণ্য, তৃণভূমি, দিন ও রাত্রি মানুষের কাছে যেমন ছিল বিস্ময়ের তেমনই কৌতূহলের।

গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঝগড়া, বিবাদ, শত্রুতা, নৃশংসতা, লুঠপাঠ, দাস অপহরণ, হত্যা, গণহত্যা ছিল, কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগেও গ্রামগুলি কী এসব বিপদ মুক্তি? নীতিবোধ, মানবিক বোধ কী এমনকিছু উচ্চস্তরে উঠেছে? মানুষের কল্পনার দেবতারা বরং আজকের রাষ্ট্রপ্রধানদের মত রাজনীতিক। কূটনীতিক ও ধুরন্ধর চরিত্র ছিল। সিন্ধুতীরের উন্নত কৃষিজীবী সভ্যতাকে যখন যাযাবর আর্যরা ঘোড়ায় টানা রথ, লোহার অস্ত্রের জোরে গ্রামগুলিকে জয় করে সেখানে জোর যার মুল্লুক তার নীতিবোধ প্রশ্রয় পেলেও, তারা সবসময়েই সমাজের কল্যাণের কথা ভাবত।

পুরুষরা সমাজে বহুবিবাহ করতে পারত। কোন কন্যার অবিবাহিত থাকা সমাজ অনুমোদন করত না। কিন্তু কোন কারণে কন্যাটি বিধবা হলে দেবর তাকে জীবনমুখি করে তোলার জন্য সম্ভোগ করতে পারত। মেয়েদের সহমরণে যেমন যেতে হত না, বিধবার জীবনও কাটাতে হত না। সমাজে বধূ ছিল অলংকার। বহুজনের মধ্য থেকে যে নারী একজনকে নিজেই বেছে নেয় সে সুকল্যাণী। সংসারে সুখ আসে। ঋগ্বেদের সমাজচিত্র থেকে দেখা যায় বরপণের বদলে কন্যাপণই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, যদিও সমাজে তখন শ্রেণী বিভাজন শুরু হয়ে গেছে। আর্যরা এ-দেশের মানুষকে তাদের থেকে নিচু জাত মনে করত, দাস মনে করত। তখনই বর্ণভেদ প্রথা জন্ম নিয়েছে। ব্রাহ্মণরা পুরুষের মুখ থেকে, রাজারা বাহু থেকে, বৈশ্য বা বণিকরা উরু থেকে আর শুদ্ররা পা থেকে।

ঐ সুদূর অতীতে সমাজে দুঃখী ও দরিদ্র মানুষেরাও ছিল। সমাজে অভাব ও বৈষম্য ছিল। যার ফলে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। অভাব না থাকলে, লোকে চুরি করবে কেন? চোরের কঠোর শাস্তিও ছিল। আজকের মতই

ধনীরা ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সাবধানে রাখতে বাধ্য হত। পথে ঘাটে লোকে ডাকাতের হাতে পড়ত। সমাজে জুয়াড়িরাও ছিল, যারা রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে, এখন এ দৃশ্য আমরা স্টকএক্সচেঞ্জে দেখি। সমাজে শুদ্রদের তাদের থেকে উঁচু তিনবর্ণের সেবা করতে হত। তারা সমাজের দাস, তাদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না।

অবশ্য যাযাবর আর্যরা এদেশে এসে ধীরে ধীরে কৃষিজীবী হয়ে ওঠে, কৃষিজীবী হওয়ায় এক জায়গায় থিতু হয়ে বসবাস শুরু করে, এবং ধীরে ধীরে নগর-কেন্দ্রিক গ্রামীণ জীবনের প্রসার ঘটায়। আদিম কৃষিজীবী সভ্যতায় খাবারের নির্দিষ্ট সংস্থান ছিল না, নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতায় তা অনেকটা নিশ্চিত হয়। তবে আজকের মতই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, বন্যা, পঙ্গপাল শস্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষ দেবতাদের শরণাপন্ন হত। অন্নের স্তব করে তারা ভাবত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাবে। আমরা কী ওদের থেকে সভ্যতার রথে খুব একটা এগিয়েছি? ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বর্তমানকালের মতই শঠতা, প্রতারণা ছিল। সুরাপান বা মদ্যপান সমাজে নৈতিকতার অবনমন মনে করা হলেও, লোকে কাজ উদ্ধারে উদ্ধারকারীকে সোম পান করাত। সোমপায়ী সোমপানে আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ করত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যে ভরা ঋগ্বেদের সময়কার গ্রাম জীবন ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত। যদিও সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যা দাস বা শূদ্রদের জীবন কাহিনী ঋগ্বেদের সমাজচিত্রেও স্থান পায়নি। ফলে ঐ সময়ের সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবন আলেখ্য আমরা খুব একটা পাই না।

৩

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এর সময়কাল নিয়ে পন্ডিতদের নানা মত থাকলেও আমরা ধরে নিতে পারি ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৩০০ থেকে ১৮৫০ বছর আগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র লেখা হয়েছিল। এই সময় ভারতবর্ষে শুধু গ্রাম না, নগরসভ্যতাও দেখা দিয়েছে। গ্রামের ক্ষেত্রে সর্দার বা গোষ্ঠীপ্রধান থাকলেও, নগররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাজা এসে গিয়েছে। যার অধীনে স্বাধীনভাবেই থাকছে হাজার হাজার গ্রাম। এ-সময় গ্রামের ছবিটা কেমন ছিল তার একটা রূপ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অমরা পাই। যেমন, যখন রাষ্ট্রপ্রধান নগর প্রশাসন চালানোর জন্য দায়ী, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত গ্রামগুলো ভালভাবে পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। রাজার রাজত্বে যত গ্রাম, তৃণভূমি, পরিত্যক্ত স্থান, অরণ্য এসব দেখভালের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। যদিও সাম্রাজ্যের প্রতিটি রাজ্যের গভর্নর বা প্রধান প্রশাসকরা প্রধানমন্ত্রীর অধীন। ফলে আজ থেকে দুই-আড়াই হাজার বছর আগে গ্রামের সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা) বা প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই একুশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রেও কিন্তু গ্রামের প্রশাসন গ্রাম পঞ্চায়েত চালায়। একটি গ্রামের রাজনীতি ও অর্থনীতির অগ্রগতি পঞ্চায়েত প্রধানদের ওপর নির্ভর করে। অতীতে গ্রাম পরিচালনায় কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাব ছিল না, কোন রাজনৈতিক আইডেনটিটি বা পরিচয় ছিল না, বর্তমানে আছে। যদিও সেকালের মতো আজকালও গ্রামের ঘটনাবলীর, প্রশাসনের রেকর্ড রাখা হয়। গ্রামে রাজা মন্ত্রী আমলাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকার ফলেই, সুদূর প্রাচীনভারতেও আজকের মতো গুপ্তচরবৃত্তি প্রধান্য পায়। তবে সেকালে গুপ্তচরদের লোকে ঘৃণার চোখে দেখত, একালে সিবিআই, সিআইডি-রা গুরুত্ব বা মর্যাদা পায়।

প্রাচীনকালে গ্রামগুলো প্রকৃত অর্থেই স্বশাসিত ছিল, বর্তমান কালের মতো শাসকদলের মানুষ বিরোধীদলের মানুষ এরকম কোন সীমারেখা বা বিভাজন ছিল না। ফলে গ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব যে গ্রামিকা-র ওপর থাকত, তার দায় দায়িত্ব ছিল অনেক। গ্রাম প্রধানকে সবাই শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। গ্রাম প্রধান গ্রামের মন্দির সম্পত্তি, বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কোন নাবালকের সম্পত্তি, জমি নিয়ে বিবাদ এবং স্থাবর সম্পত্তির বিক্রিবাটার দেখভাল করতেন। ঋণ মেটানোর ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ গ্রহীতাকে সরাসরি না পেলে, গ্রাম প্রধানের কাছে ঋণের টাকা জমা করে দিলেই হত। তিনি পাওনাদারকে সেই টাকা দিয়ে দিতেন। গ্রামের আইনশৃঙ্খলা দেখভালের পাশাপাশি ঝগড়াঝাটিও মিটিয়ে দিতেন। গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করা হত স্তম্ভ বা পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিকে চারটি তোরণ নির্মাণ করে। এই সীমানা চিহ্নিত করণের বাপারটা ভারতের কিছু কিছু গ্রামে এখনও আছে। সম্প্রতি চিন,

ভিয়েতনামেও দেখে এসেছি। এই সীমানার মধ্যেই একটি গ্রামের মানুষ বসবাস যেমন করবে। চাষ-আবাদ করবে। অন্য গ্রামের সীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে না। বাড়ি থেকে কোন কারণে পালিয়ে আসা কোন নারীকেও গ্রাম প্রধান আশ্রয় দেবেন। গ্রামের প্রশাসন দেখভালের কাজের জন্য গ্রাম প্রধানকে গ্রাম ছেড়ে যদি অন্য কোথাও যেতে হয়, গ্রামবাসীদের কেউ না কেউ, বা একাধিক জন্য পালা করে তাঁর সহায্যকারী হিশেবে যাবেন। গ্রামের যে কোন উৎসব, আমোদ-প্রমোদ বা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে শ্রম বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হত। অবশ্য এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না। গ্রামবাসীর ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেওয়া হত। যদিও কেউ উৎসবে যোগ না দিয়ে চায়, দিত না। তবে একটা বিষয় নির্দিষ্ট ছিল গ্রামের ভালর জন্য কোন গ্রামবাসী ভাল কোন প্রস্তাব দেন, যাতে গ্রামের সবার উপকার হবে, সেই প্রকল্পকে প্রতিটি গ্রামবাসীকে সমর্থন করতে হত। প্রতিবেশীকে সাহায্য না করলে, বা কোন কারণ ছাড়াই প্রতিবেশীর ভাল কাজে বাগড়া দিলে ১০০ পান (তখনকার মুদ্রা ব্যবস্থা) জরিমানা দিতে হত।

কৌটিল্যের সময় একজন আর্যপুরুষের খাবার দাবারের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জানা যায়। একজন আর্যপুরুষের রেশন তালিকা ছিল এক প্রস্থ ভাত (প্রায় এক কিলোগ্রাম), ১/৪ লিটার সব্জি, ১/১৬ লিটার ঘি বা তেল ও নুন। যারা হাতির দেখভাল করত তারা পেত এক লিটার সেদ্ধ ভাত, এক কাপ তেল, ১৬০ গ্রাম চিনি, ৮০০ গ্রাম মাংস ও নুন। বছরের বেতন ৬০ পান এক আধক বা চারপ্রস্থ শস্যের সমান, দিনে চারবার কোন একজনের খাওয়ার পক্ষে যা ছিল যথেষ্ট। তবে একথাও মনে রাখা উচিত একজন আর্য যে পরিমান খাবার প্রতিদিন পেতেন তার সমানই দানাশস্য ও লচন পেতেন নিচু-শ্রেণীর মানুষেরাও, কিন্তু আর্যদের ২/৩ ভাগ সব্জি ও ১/২ ভাগ তেল পেতেন। আর্যদের তুলনায় মেয়েরা পেতেন ৩/৪ ভাগ আর শিশুরা ১/২ ভাগ সব খাবারই। দেখা যাচ্ছে উঁচুবর্ণের লোকেরা যে পরিমাণে খাবার বা পানীয় পেতেন, নিম্নবর্ণের লোকেরা, নারীরা ও শিশুরা তা পেতেন না। বর্ণবিভাজন, লিঙ্গ-বিভাজন ও বয়েস বিভাজন অনুসারে খাবার পেতেন। খাবার নিয়ে নানা বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু শুধু গ্রামাঞ্চলে না, নগরাঞ্চলেও ছিল। ধর্মশাস্ত্রে এসব কিছুই লিখিত আকারে নির্দেশিত ছিল। কিন্তু একজন হাতি সেবক মাংস পাবেন, অথচ হাতির ডাক্তার কেন মাংস পাবে না তার কোন ব্যাখ্যা ছিল না।

রান্নার উপকরণও ছিল বিচিত্র বিভিন্ন রকমের চাল, ডাল, গম, বালি, যব, ভুট্টা, ধীন, শাকপাতা, মাখন, ঘি, নানারকম ভেজিটেবল তেল, সর্ষে, চিনি, মধু, গুড়, ভিনিগার, তেঁতুল-লেবু-ডালিম ফলের রস, দুধ-ঘোল-দই, লঙ্কা, আদা, নানারকম সব্জি, ফল, মাংস ও মাছ।

পথে রেস্তেরাঁয় বিভিন্ন দোকানে যেসব খাবার বিক্রি হত। সেখানে কোন ঠগবাজি হচ্ছে কী না? দেখত গুপ্তচর বিভাগ। যার মাথা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অনেক সময় শত্রুপক্ষকে নিকেষ করতে গুপ্তচর বিভাগ খাবারে বিষ মাখিয়ে রেখে দিত। রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে তাদের মৃত্যু হত। তবে যে কোন গ্রামে বা পথচলতি রেস্তোরাঁয় কোন অজানা আগন্তুককে আশ্রয় দেওয়া নিষেধ ছিল। গ্রামের কোন রেস্তরাঁ বা সরাইখানায় আমিষ ও নিরামিষ দুরকম খাবারেরই ব্যবস্থা থাকত। রুটি বিক্রেতা, মিষ্টি বিক্রেতা, সব্জি বিক্রেতাও ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের গ্রামের এই ছবি আজও প্রায় একইরকম অনেক জায়গায় থেকে গেছে।

সেই সময় গ্রামের মানুষ কি ধরণের পোশাক-আশাক পরতেন ও সাজ-সজ্জা করতেন তার কোন হদিশ না পেলেও কি দিয়ে পোশাক আশাক তৈরি হত তার বিবরণ অর্থশাস্ত্রে আছে। যেমন—তুলো, উল, গাছের ছাল ও চামড়া থেকে তৈরি পোশাক, শন, রেশম ও সুতির পোশাক, পোশাকের গুণগত মান তিন ধরনের হত। সূক্ষ্ম, মাঝারি ও কর্কশ। চামড়া ও ফারের পোশাকও পাওয়া যেত।

হিরে, মুক্তো, দামি পাথর খচিত সোনার অলঙ্কারও লোকে পরত। হাতে, মাথায়, গলায়, পায়ে, কোমরে নানা ধরনের অলঙ্কার শোভা পেত। নানারকম মুক্তোর হারের জনপ্রিয়তা ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুগন্ধি ব্যবহার করত, বিশেষত চন্দন ও ঘৃতকুমারী। সোনা ও দামি পাথরের মতো সুগন্ধিও ছিল মূল্যবান, বিলাসিতার উপাদান। ফুলের মালাও অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হত।

লোকেরা অবসর সময় কাটাত নানা আমোদ প্রমোদে। ব্যক্তিগত আনন্দ উৎসব যেমন ছিল, সার্বজনীন

আমোদ প্রমোদও ছিল। অন্যদিকে জুয়াখেলা, মদ্যপান, বেশ্যাগমনের মতো আমোদও ছিল। কিন্তু এসব নগর লাগায়ো গ্রামে সম্ভব ছিল। জন্ম, জন্মদিন পালন ও বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে আনন্দ উৎসব ব্যক্তিগত ছিল। অন্যদিকে জনপরিসরে বা পাবলিক স্ফিয়ারে অভিনয়, নাচ-গান, সংগীত, মুকাভিনয়, আবৃত্তি, গল্প-বলা, অ্যাক্রোবাট, ভোজে-বাজি বা ম্যাজিক গ্রামীণ জনজীবনে আনন্দ আনত, অনেক সময় এইসব শো দিনরাত্রি জুড়ে হত। স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি নিতে হত শো দেখার ব্যাপারে। আবার এমনকিছু শো ছিল যা শুধু মেয়েদের জন্য এইসব শো দেখানোর যে খরচ গ্রামবাসীরা ভাগাভাগি করে দিত। আজ থেকে আড়াই/তিন হাজার বছর আগের গ্রামের এই যে প্রথা বা নিয়ম, এখনও ভারতের অনেক গ্রামে আছে। আধুনিক কালে অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য এইসব পাবলিক স্ফিয়ারে নাক গলায়। তবে অলিখিত নিয়ম ছিল, বর্ষাকালে বা চাষবাসের সময় গ্রামবাসীরা যাতে আমেদ প্রমোদে মেতে না ওঠে, পাবলিক স্ফিয়ারে আমোদ প্রমোদ বন্ধ রাখা হত। শিল্পীদের স্বাধীনতা ছিল যে যার অঞ্চলের রীতি-নীতি, প্রথা, বর্ণব্যবস্থা, পরিবার বা কোন ব্যক্তির প্রেম-প্রণয় নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি, ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করার। কিন্তু পয়সা খেয়ে কারো প্রশংসা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। গ্রামীণ সমাজ জীবনের এইসব বোধ আজ প্রায় নিঃচিহ্ন হতে চলেছে।

গ্রামে জুয়াখেলা বা বেটিং-এ রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু পাশা খেলা, দাবা খেলা, মুর্গি লড়াই। পশু দৌড়ের মতো প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা নিষিদ্ধ ছিল না। বা সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নিষেধ ছিল না।

কৌটিল্য মনে করতেন জুয়াড়ি মাত্রই কোন না কোনভাবে মানুষকে প্রতারণা বা চিটিং করে। জুয়াড়িদের জন্য তাই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তাই রাষ্ট্র নির্দেশিত স্থানে ছাড়া জুয়াখেলা যেত না। দেখা যাচ্ছে গ্রামবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর বিষয়গুলোতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল। মদ তৈরি ও বিক্রির ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিল না বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ক্যাম্পে মদ পান করা যেত। মদ পানের হল তৈরি করা হত, যেখানে একসঙ্গে অনেকে মদ পান করতে পারবে। সেখানে বিভিন্ন ঘরে বসার যেমন ব্যবস্থা থাকবে, শোয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। মদ্য পানের হলটি সবসময় সুগন্ধি ও ফুলে সুরভিত থাকবে। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকবে। কেবলমাত্র ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি বাড়িতে সামান্য মদ কিনে নিয়ে যেতে পারবে। বাকিদের ঐ নির্দিষ্ট হলেই মদ পান করতে হবে। মদ পানের এরকম আধুনিক ব্যবস্থা বোধহয় একুশ শতকের গ্রামগুলোতেও নেই। সুন্দরী নারীদের সাহায্যে মদ বিক্রেতা নজর রাখবে কোন মদ্যপ কোন অশোভন আচরণ করছে কী না। যদি করে থাকে মদ্যপানের হল থেকে তাকে বের করে দেওয়া হবে।

রাজ-নর্তকী, বেশ্যা ও গণিকালয়গুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। রাজ-নর্তকী নগরের ব্যাপার, তার কাছে শুধু রাজা না, ধনী ব্যক্তিরাও সময় কাটাতে যেত। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বেশ্যালয়ও গণিকারা ছিল। সুন্দরী রূপজীবীরা তারা নিজেদের সৌন্দর্যের বিনিময়ে আনন্দ দান করতে পারত। বিনিময়ে টাকা পয়সা রোজগার করত। বিষয়টি ছিল রূপজীবীর ব্যক্তিগত ব্যবসা। কলগার্লও ছিল। তাদের নির্দিষ্ট খদ্দের থাকত, যাদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক তৈরি করত। যেহেতু এইসব বেশ্যালয়গুলি থেকে রাষ্ট্রের ভাল রাজস্ব আদায় হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে অনুমতি ছিল। আমাদের একুশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতেও ঘুরপথে এরকমই অনুমতি আছে। কৌটিল্যের সময় নারীরা অনেক বেশী স্বাধীন ছিল, না বর্তমান সময়ে? এ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা, বিতর্ক হতে পারে। বিস্তৃত সেসব আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে মনে হয়, সেসময়ে কি গ্রামীণ কি নগর জীবনে বেশ্যাবৃত্তিকে খারাপ চোখে দেখা হত না। বরং রাষ্ট্র স্পনসর করত। তবে অবাধ যৌনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হত না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা যে গ্রামের ছবি পাচ্ছি তা থেকে দেখা যাচ্ছে ২৩০০ থেকে ১৮৫০ বছর আগে ভারতের গ্রামগুলিতে যে স্বায়ত্ত্ব শাসন ও গণতন্ত্র ছিল, আমরা একুশ শতকে পৌঁছেও তা থেকে উন্নত গ্রামীণ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে পারিনি। নগর বা শহর অনেক বদলে গেছে। প্রাচীন সমাজ জীবনের স্বাধীনতা ভারতের প্রায় ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার গ্রামে নেই, প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলির চাপে ও দাপে। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে গ্রামের উন্নতির কথা বলেই এসেছে, কিন্তু

গ্রামগুলি গ্রামেই থেকে গেছে, এমনসব গ্রাম আছে যে গ্রামের কোন স্মৃতিকথা নেই বা ঘটনা নেই।

৪

ইতিহাসকাররা যীশুর জন্মের ৩৫০০ বছরে আগে থেকে যীশুর জন্মের পরের ৫০০ বছরকে প্রাচীন ইতিহাসের কাল গণনা করেন। এই সময় পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশগুলির (গ্রিস, রোম, মিশর, ক্রীট, মেসোপতেমিয়া, চিন) মতোই ভারতে দাস সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে রূপান্তরিত হতে থাকে, যদিও একটু অন্যরকম পথে, এর কারণ ভারতের বর্ণব্যবস্থা, ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের বিবর্তন অন্যভাবে ঘটেছে। গ্রাম সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কর ব্যবস্থা ও শ্রমদানকে কেন্দ্র করে বর্ণভেদ প্রথা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছিল। বর্ণসংকর সৃষ্টি হচ্ছিল। বর্ণভেদ প্রথাকে কেন্দ্র করে গ্রামজীবনে ভূস্বামী বা রাজারা দেখা দিয়েছে। যারা সমাজের নিম্নবর্ণগুলির শ্রমে পরগাছার মতো জীবনযাপন শুরু করেছিল এবং এক একটি ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠছিল। রাজার কর্মচারি ও পুরোহিতদের মাইনে না দিয়ে ভূমিদান শুরু হয়। ভূমির মালিকরা যে যার সীমানায় জমি সংক্রান্ত আইন তৈরি করে। যার জমি চাষ করত যে কৃষকরা বা শুদ্রবর্ণের লোকেরা তাদের ওপর দমন পীড়নের মালিক হয়ে ওঠে ভূস্বামীরা—যারা সবাই উচ্চবর্ণের লোক। কৃষকরা বিদ্রোহ করলে ভূস্বামীরা তাদের বিরুদ্ধে ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নিত এবং বিদ্রোহ দমন করত। এই ব্যবস্থার ফলে বনজঙ্গল কেটে নতুন নতুন গ্রামের পত্তন সম্ভব হল, নতুন নতুন অঞ্চল কৃষিজমির আওতায় এল। ব্রাহ্মণরা অন্যান্য জনজাতির লোকদের বাধ্যতামূলকভাবে বশ করে কর দিতে বাধ্য করল। শুধু ব্রাহ্মণ না, বৌদ্ধ পুরোহিতদেরও ভূমিদাস করা হত। এইসব ভূমিতে রাজার সৈন্যরা প্রবেশ করতে পারবে না এটাই ছিল আইন। গ্রাম থেকে রাজার আয়ের উৎস হল পশুচারণভূমি, পশুর চামড়া। কাঠকয়লা, নানা ধরনের বৃক্ষ, লবণ, মাদক জাতীয় দ্রব্য, শর্করা। গ্রামের কৃষকদের ভূস্বামীর জমিতে ও ভূস্বামীর প্রয়োজনে বিনে পয়সায় শ্রম দিতে হত। ভূস্বামীদের নিয়ম অনুযায়ী কৃষক ও কারিগরদের কাজ করতে হত। গুপ্ত যুগেও গ্রামের সমাজ জীবনে ভূস্বামীদের নির্দেশই ছিল শেষ কথা। রাষ্ট্র প্রধানরা শুধুমাত্র চোরেদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জমি সক্রান্ত বিবাদের বিচার ভূস্বামীদের (সমাজের উচ্চবর্ণ) হাতেই ছিল। দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ জীবনে ভূস্বামীদের কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নতুন উৎস তৈরি হচ্ছিল। কর আদায় ও অপরাধ দমন উচ্চবর্ণের হাতেই থেকে যায়। ব্রাহ্মণরা গ্রামীণ সমাজ জীবনে এই ব্যবস্থার সুযোগ কাজে লাগালেন ধর্মাশ্রিত রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুকেন্দ্র তৈরি করে। ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে মৌর্যযুগে যেসব রীতিনীতি ছিল গুপ্তযুগে তার অনেক বদল ঘটে যায়। গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণে ভারতীয় সমাজ জীবন বিভক্ত ছিল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে কৃষির অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল, কেননা নতুন নতুন চাষের জমিতে কাজের জন্য নতুন নতুন লোকের চাহিদা বাড়ছিল অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা। প্রধানত শূদ্ররা কৃষিজীবী ছিল। মাঝে মাঝে চাষের জন্য অস্থায়ীভাবে জমির দখল পেত তারা। শূদ্রদের যেহেতু জমি ছিল না, রাষ্ট্র তাদের ওপর কোন কর বসাত না কিন্তু তাদের শ্রম যে কোন রাজকার্যে দিতে বাধ্য করত। শূদ্ররা ছিল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক।

ভূমিদাস ব্যবস্থায় মধ্যযুগে ফসল কাটার বদলে কৃষক ও কারিগররা মজুরি পেত। কিছু জমিও তাদের চাষবাসের জন্য দেওয়া হত। যজমানি ব্যবস্থা, কিন্তু খ্রিস্টিয় ছয়ের শতক থেকে যখন দূর বাণিজ্যের পতন নেমে আসে, ভারতীয় গ্রামীণ জীবনে সংকট নেমে আসে। স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রার অনুপস্থিতি সংকট আরো ঘনীভূত করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনে নগর জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। ফলে লোহা, তেল, মশলা, নুন, জামাকাপড় বেঁচে থাকার এসব প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রামবাসীদেরই উৎপাদন করতে হত। গ্রামে গ্রামে হাট ও মেলা দেখা দিতে থাকে। এক একটি গ্রাম হয়ে ওঠে এক একটি জিনিস উৎপাদনের কেন্দ্র। গ্রামের হাটে বা জেলায় তাদের উৎপাদিত জিনিস বিক্রি হত। পাবলিকফিয়ার তৈরি হল। উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রমব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ ঘটল। স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠল। অন্যদিকে জনজাতি অঞ্চলগুলিতে জমির যৌথ মালিকানা দেখা দিল। গ্রামের কয়েকটি পরিবার মিলে একটি জমি চাষ করে, ফসল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে

নেবে। জমি নির্ভর সমাজ তিন-চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—

রাজা
↓
ভূস্বামী
↓
ক্ষেত্রিক বা কর্ষক (যারা জমি চাষ করবে)
↓
উপকর্ষক

মধ্যযুগের ভারতে জমির অধিকার ও গ্রাম পরিচালনার অধিকারকে কেন্দ্র করে রাজনীতি ও অর্থনীতি আবর্তিত হয়ে ধনী কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। অন্যদিকে শ্রমজীবী শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটেছিল। যাদের থেকে জোর করে শ্রম আদায় করা হত। এদের রাস্তাঘাট তৈরি, পুকুর নির্মাণ, দুর্গ ও প্রাসাদ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হত। মাঝে মাঝে কৃষিকাজেও ব্যবহার করা হত। তবে ভারতের প্রতিটি গ্রামেই কৃষকদের নানা স্তরভেদ ছিল। গ্রামীণ জনবৃত্তের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস মধ্যযুগে প্রাচীনযুগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষি বিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি হয়। কৃষি-জ্যোতির্বিদ্যা উন্নত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো বদলায়নি। গ্রাম জীবনে পরিবার ও পরিবারের রীতি-নীতি সবাই মেনে চলত। নিম্নবর্ণের মানুষেরা—কি পুরুষ কি মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। মধ্যযুগে গ্রামজীবনে যে পরিবর্তনটা এল ধনীরা নিজেদের স্বার্থে বিয়ের ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধ আরোপ শুরু করল। অর্থাৎ সুবিধে ভোগী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হল। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা হয় কৃষক নয় শ্রমজীবী মানুষ। উচ্চবর্ণের লোকেরা বহুবিবাহ করতে শুরু করল। নিজেদের বংশমর্যাদা রক্ষার নামে শিশুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথাকে উৎসাহ দিত। সমাজে পণপ্রথা বৃদ্ধি পেল, বিশেষত ধনী পরিবারগুলি ভূমিদান, কন্যাদান প্রথাকে স্বীকৃতি দিল। পণের মধ্যে কন্যা দানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম দান করা হত (ভূমিদান)। সমাজে নতুন অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা দিল। কারিগররা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শুরু করল। শূদ্রদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। শ্রম ব্যবস্থা বদলে যাওয়ায় স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি দেখা দিল। উঁচু বর্ণ ও নিচু বর্ণের নারী পুরুষের সংমিশ্রণে নানা মিশ্র জাতি দেখা দিল। সংস্কৃতির সংঘাতে কাল্পনিক দেবদেবীদেরও গ্রহণ বর্জন শুরু হয়েছিল। জনজাতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বজায় রাখতে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন ও ব্যবহার শুরু করেছিল। লিপির পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছিল। জমি ও অন্যান্য বিষয়ের নথিপত্র লিপিকররা রাখতেন। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ মতো ধর্ম বিষয়ে লেখালেখিও করতেন। ভাষা জন্ম নেওয়ায় সাহিত্যও সৃষ্টি হচ্ছিল। মধ্যযুগে প্রাচীন সাহিত্যের সংকলনগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে। ভাষা সমাজে ক্ষমতার বিন্যাসও নতুনভাবে তৈরি করতে শুরু করে। দক্ষিণ ভারতে এক একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্ণের লোকেদের প্রাধান্য সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকে। ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে থাকে। আগে কৃষিকাজে আদিবাসী মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিন্তু নতুন ভূমি ব্যবস্থার ফলে কৃষিকাজ পুরুষদের হাতে চলে যায়। জনজাতির নারী ভাবনা ব্রাহ্মণ্য পুঁথি ও মূর্তিতে মাতৃদেবী হিশেবে স্থান পায় শ্রমের কর্মস্থল থেকে নারীকে দেবীতে রূপান্তরিত করে নতুন সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরুষ কেন্দ্রিক ব্যবস্থা হিশেবে পাকা করা হল।

মধ্যযুগে ভারতীয় গ্রাম সমাজে বর্ণবৈষম্য নানা স্তরে সমাজে শেকড় ছড়িয়ে দেয়। নিম্নবর্ণের মানুষরা মাঝে মাঝে প্রতিবাদ প্রতিরোধে গা ঝাড়া দিলেও, উচ্চবর্ণের লোকের ধর্মের অনুষঙ্গে নানা কৌশলে তা ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয়। মন্দিরের জমিকে কেন্দ্র করে ভূমি বিতর্কও দেখা দেয়।

ভারতের মাটির দখল তুর্কি মুসলমানরা নিলে, তাদের নতুন শাসন ব্যবস্থায় ভারতের সমাজ জীবনে নানা পরিবর্তন দেখা দিল। ভূমি হস্তান্তরের দলিল যদিও চারশতক থেকে সাতের শতকের মধ্যেই প্রচলিত হয়ে

গিয়েছিল। তুর্কি মুসলমান ও মুঘল আমলে গ্রামজীবনে বড় ধরণের পরিবর্তন এল। মুসলমান শাসকদের প্রচলিত আইন ও হিন্দুদের প্রায় একই ছিল। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলি হিন্দু আইনের নিয়মকানুন তৈরি করেছিল, আর মুসলিমরা আইন তৈরি করেছিল তাদের ধর্মশাস্ত্র কোরান থেকে। ভারতীয় সমাজ জীবনে রাজারাজড়া সুলতান সম্রাট আমীর ওমরাহ থাকলেও, মুলত ভারতের গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করেই সমাজ জীবন প্রবাহিত হত। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না, ছিল নগরকেন্দ্রিক গ্রামসমাজ। প্রায় প্রতিটি গ্রামই ছিল স্ব-নির্ভর। এক একজন মানুষের জন্ম বেঁচে থাকা, বিবাহ ও মৃত্যু একটা গ্রামেই ঘটে যেত। আমার যৌবনকালেও এরকম অনেক মানুষ দেখেছি। আবার এমনসব গ্রাম দেখেছি, বিগত একশ বছরে সে গ্রামের সমাজ জীবনে কোন ঘটনা নেই।

৫

যে কোন গ্রাম সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হল পরিবার। গ্রাম জীবনে কৃষিকাজই প্রধান কাজ। আর কৃষিকাজ যিনি করেন। তাঁকে আমরা বলি কৃষক। সমাজ পরিবর্তনে কৃষক সমাজের ভুমিকার কথা দীর্ঘদিন ইতিহাসে অনুপস্থিত ছিল। বিগত শতকের আটের দশকের গোড়া থেকে ইতিহাসের সাবঅল্টার্ন চর্চার ফলে, পরবর্তীকালে উত্তর আধুনিকতার ধারণা সমুহে কৃষকদের গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকার কথা তুলে ধরা হয়। গ্রাম জীবনে এই কৃষকদের মধ্যেও নানা স্তর দেখা যায়। ধনী কৃষক, গরিব কৃষক, ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর বা দিনমজুর কৃষক। সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই আমরা কৃষকদের উত্থানের কথা জানতে পারি। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার বছর চলে গেলেও, গ্রাম ভারতের কৃষিজীবনে খুব একটা পরিবর্তন এসেছে বলা যাবে না। পরিবর্তন যেটা এসেছে, তা বড় বড় কসমোপলিটান শহরের আশেপাশে বা বড় বড় ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে কাছে। বিশ্বায়নের দৌলতে গ্রাম জীবনে আধুনিক পণ্য সম্ভার পৌঁছোলেই প্রান্তিক গ্রামগুলি প্রাচীন বা মধ্যযুগেই থেকে গেছে। যেমন কৃষিকাজ ছাড়া বন্যার জল ধরে রাখা, বাঁধ নির্মাণ, জমির আল তৈরি করা, খাল কাটা, পুকুর কাটা, বনসৃজন, জলাধার তৈরি আজও ভারতীয় গ্রাম জীবনে প্রধান কাজ। গবাদি পশুর চারণভুমি কমে গেলেও গ্রামে পশুদের খাবার তৈরিও কৃষিজীবনের অঙ্গ। গ্রাম বদলাচ্ছে। যদিও তার গতি বেশ মন্থর।

সুলতানি আমলে বা মুঘল আমলে কৃষককুলকে বশে রাখার কাজটা ক্ষুদে ক্ষুদে ভুস্বামী বা জমিদাররা করত। কেউ কেউ রাজা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কৃষক জীবনে প্রাচীন যুগের থেকে খুব একটা পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সম্রাটরা কৃষকদের খোঁজ নিতেন যুদ্ধের সময়। সম্রাটদের নির্দেশ আসত ভুস্বামীদের কাছে; ভুস্বামীরা গ্রাম থেকে দলে দলে কৃষকদের পাঠাতেন সৈন্যদলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। তবে সুলতানি আমল থেকে মুঘল যুগে ভারতীয় গ্রামের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছিল। ছোট ছোট নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের উত্থান ঘটেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। বিনিময় ব্যবস্থা থাকলেও, মুদ্রা ব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল। এক একটা নদী ও নদীর অববাহিকার দুকুল ধরে গ্রামীণ জনপদ গড়ে উঠত। আজ যে গঙ্গার অববাহিকা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে আমরা ঘনঘন ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ও শহরের দেখা পাই, একসময় তা ছিল অরণ্য। মুঘল আমল থেকে বৃটিশযুগ পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম জীবনে ক্ষমতার কেন্দ্রে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রই শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণী হিশেবে থাকল। এখন যেমন কয়েকটি শিল্পপতি পরিবারের হাতে ভারতীয় অর্থনীতির বেশিরভাগ সম্পদ, বৃটিশ আমল পর্যন্ত পুরোহিত তন্ত্রের লোকজনের হাতে গ্রামের বেশিরভাগ জমি থাকত। কৃষকরা যে ফসল ফলাত তার ভাগ অবশ্য খাজনা হিশেবে রাজাকে দিত। সে যাই হোক ভারতের প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, সুলতানি ও মুঘল যুগ, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ২০০ বছরের ইতিহাস পাঠ করে গ্রামের ভেতরের মৌলিক সামাজিক সম্পর্কগুলিতে কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই না। নগরগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সভ্যতা এগোলেও ভারতীয় গ্রামজীবনে, বিশেষত বর্ণ ব্যবস্থায় ইসলাম যেমন কোনপ্রভাব ফেলতে পারেনি, বৃটিশরাও পারেনি। ভারতীয় গ্রাম জীবনে বর্ণব্যবস্থার এই একুশ শতকেও প্রকাশ্যে ও নানা ছদ্মআবরণে বিদ্যমান। নগরকেন্দ্রিক জীবনে বর্ণব্যবস্থার প্রভাব কমলেও, গ্রাম জীবনে বহাল তবিয়তে থেকে গেছে।

ভারতীয় গ্রামগুলিতে কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে যে আত্ম-নির্ভরতা ছিল, তা নগরজীবন থেকে গ্রামগুলিকে বিশ শতক পর্যন্ত বিচ্ছিন্নই করে রেখেছিল। আত্ম-নির্ভরশীলতা ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না বলে গ্রামজীবন নিস্তরঙ্গ ছিল। যার ফলে বংশ পরম্পরায় বর্ণ নির্ধারিত বৃত্তি গ্রামজীবনে শেকড়ে গেড়ে বসেছিল। বর্তমানে গ্রামের পণ্য বাজারে এলেও, গ্রাম জীবনের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বিশ্বায়নের অভিঘাতেও ভাঙেনি, সামান্য চিড় ধরেছে মাত্র। কেননা এই বর্ণব্যবস্থাকে আধুনিক রূপে আজও ভারতীয় শাসকশ্রেণী (যাদের বেশির ভাগ উচ্চ বর্ণের লোকজন) ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতাদখলের জন্য কাজে লাগায়। ভারতের ভোট রাজনীতির একটি বড় উপাদান এই প্রাচীন বর্ণব্যবস্থা। গ্রাম জীবনের বর্ণভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় গণতন্ত্রে মাথা চাড়া দিয়েছে আইডেনটিটি রাজনীতি। যার নির্ধারক ভারতের ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ গ্রাম বা গ্রামের মানুষ। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক যুগের ইতিহাসে তাকালে আজও আমরা দেখতে পাই (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে উন্নতিই হোক না) ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা আজও ভারতের ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বর্ণ ব্যবস্থার ভূমিকাকে ভারতের গ্রামীণ জীবন থেকে ছিন্ন করতে না পারলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিস্মরণীয় সাফল্যের যুগেও আমরা পুরাণ কল্পের যুগে থেকে যাব।

৬

গ্রাম কি? গ্রাম বলতে আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে কিছু খড়ের টিনের-টালির বাড়ি, কাঁচা পাকা রাস্তা, ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন পাড়ার মধ্য দিয়ে চলে গেছে, যেমন মাইতি পাড়া, জানা পাড়া, ভৌমিক পাড়া, ভুঞা্যা পাড়া, তাঁতি পাড়া ... পাড়াগুলিকে ঘিরে নানা ফল-পাকুড়ের গাছপালা, বাঁশবন, শাকসব্জি রবি ফসলের জমি, আর কৃষিজমি। মাইলের পর মাইল কৃষিজমি, আলবেঁধে সীমানা, জমির মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে বাঁধ, কোথাও কোথাও খোলা জমি ও অরণ্য ঘেরা গ্রাম, নদীপথের পাশে পাশে কয়েকটি পাড়াকে নিয়ে এক একটি গ্রাম। আর প্রতিটি পাড়াতেই থাকবে কিছু বাড়িঘর, সব্জিখেত, পুকুর, বাগান ইত্যাদি। ভারতীয় সমাজের পরিকাঠামো অনুযায়ী পাড়াগুলি জাতি, গোষ্ঠী, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়, পরিবার, আত্মীয়স্বজন কেন্দ্রিক।

গ্রাম					
পাড়া-১	পাড়া-২	পাড়া-৩	পাড়া-৪	পাড়া-৫	পাড়া-৬
কোন জাতি	কোন জনজাতি	কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়	পরিবার	আত্মীয়বর্গ	পেশা ভিত্তিক

এক একটা পাড়ায় কোন জাতির লোকরা বাড়ি তৈরি করে বংশপরম্পরায় থাকতে পারে, কোন জনজাতির লোকরা থাকতে পারে, মুসলিম বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক থাকতে পারে, কোন পরিবার—যেমন মাইতি পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের বাসস্থান নিয়ে একটি পাড়া হতে পারে, আত্মীয়রা পাশাপাশি থাকতে পারে, আবার পেশা ভিত্তিক থাকতে পারে যেমন— কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, মুচি পাড়া, তেলি পাড়া, ঘরামি পাড়া ইত্যাদি। পাড়া হল কয়েকটি পরিবারের সামাজিক সমন্বয় সম্পর্ক ও মেলামেশার পাড়া। আবার এই নানা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পৃক্ত পাড়াগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রাম। গ্রাম তার ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুযায়ী একটি স্বনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। একটি গ্রামে সব পাড়া বা পরিবারের মধ্যে সমন্বয় যেমন থাকে, অনেক সময় গোষ্ঠীগত বা জাতিগত, সম্প্রদায়গত শত্রুতাও থাকে।

ভারতের মতো একটি উপমহাদেশের ক্ষেত্রে, যেখানে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০-র বেশি গ্রাম আছে, এক একটি গ্রামকে একক হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এক একটি গ্রামের একক বা ইউনিট হল পরিবার। বিশ শতকের গ্রামে ভারতীয় গ্রামগুলিকে রাজনীতি যতটা না গ্রাস করেছিল। এই একুশ শতকে অনেক বেশি গ্রাস করে নিয়েছে। যা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে বিভিন্ন গ্রামের স্বশাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে। ফলে আগে যেমন এক একটি গ্রামের নিজস্ব পরিচয় বা

আইডেনটিটি ছিল রাজনীতির দশচক্রে তা ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। বিশেষত ভোট রাজনীতির নাগপাশে বাঁধা পড়ে। একটি গ্রামের জমি, গোচারণ ক্ষেত্র, বনাঞ্চল, পুকুর, কুয়ো, মন্দির, মসজিদ বা গির্জা গুরুদুয়ার ব্যবহারে গ্রামের মানুষেরা সবাই মিলিত হতে পারত, বিশেষত কোন উৎসব, মেলা বা পুজোকে কেন্দ্র করে কিন্তু বর্তমানে সেখানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে গ্রামের বুনট নষ্ট করে দিয়েছে। রাজনীতি গ্রামে 'আমরা' 'ওরা' বিভেদরেখা তৈরি করেছে।

ভারতীয় গ্রাম ছিল স্ব-নির্ভর ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। যে গ্রামে কুমোরপাড়া আছে সেখান থেকে গ্রামের পাবলিক স্ফিয়ার হাটে হাঁড়ি কলসি মিলত, কামারপাড়া থেকে লাঙ্গলের ফাল, ছুরি-কাঁচি, মুচিপাড়া থেকে জুতো, জেলেপাড়া থেতে তাঁতের শাড়ি, গামছা। গ্রামের হাটে শহরে কারখানায় তৈরি পণ্যসামগ্রী মিলত। গ্রামে গ্রামে পারস্পরিক লেনদেন শুধু হত না, আন্তঃগ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল।

অবশ্য পরিবারকে কেন্দ্র করে অতীতে যে বর্ণব্যবস্থা ছিল, শহরের আশেপাশে থাকা গ্রামগুলোতে সে বর্ণব্যবস্থায় ভাঙন ধরলেও, ওই একুশ শতকেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমবেশি জাতপাত ব্যবস্থাটিকে আছে। একাধিক গ্রাম নিয়ে খাপ-পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও আছে। একুশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতের গ্রামগুলি থেকে বর্ণব্যবস্থার শেকড় উপড়ে ফেলতে পারেনি। প্রধাণত রাজনৈতিক দলগুলি জাতপাতের রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে। গ্রামে গ্রামে জাত-পঞ্চায়েত ছাড়াও গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে। জাত-পঞ্চায়েতে যেমন একটি জাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়। গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন জাতের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। যদিও পেশার সুবাদে এক জাতকে অন্য জাতের ওপর নির্ভর করতে হয়। একটি গ্রামসমাজে ব্রাহ্মণের যেমন প্রয়োজন আছে (যা ক্রমশ বিলীন), শূদ্রেরও প্রয়োজন আছে। বিশ্বায়নের অভিঘাতে জাত ভিত্তিক পেশা গ্রাম থেকে উঠে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ এখন জুতো কেনে বাটা বা শ্রীলেদার্স বা খাদিমের দোকান থেকে, কোন মুচির কাছ থেকে না।

একশ বছর আগেও এক পেশার মানুষ অন্য পেশার মানুষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিশ নিতেন বিনিময় প্রথায় বা মুদ্রায়। বর্তমানে মুদ্রা-ই প্রধান। যদিও বিনিময় প্রথার অন্য রূপ-ও আছে, যেখানে আর্থিক প্রথা ছাড়া সামাজিক প্রথাও বর্তমান আছে। যদিও বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি এসে এইসব বিনিময় প্রথাকে অবলুপ্তির পথে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিশ্বায়নের পণ্য সামগ্রী গ্রাম-গ্রামান্তরে দ্রুত যাতে যেতে পারে তার জন্য গ্রামের অভ্যন্তরে পাকা রাস্তা বা পিচঢালা পথ তৈরি হচ্ছে। সেইসব পথে পণ্যবাহী গাড়ি সহজেই প্রবেশ করছে। বর্তমানে গ্রামে ঘরে জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পানীয় ঢুকছে। গ্রাম-সংস্কৃতির পুরোনো চেহারাটা আর থাকছে না। যাত্রা-পালা, লোকগান, কথকতা, কীর্তন—এসব শোনার চেয়ে গ্রামের মানুষের কাছে এখন বেশি আকর্ষণ টেলিভিশনের শত শত চ্যানেল, গ্রামের মোড়ে ভিডিও হল।

এই একুশ শতকের আগে পর্যন্ত সন্ধ্যার পর গ্রামের কোন কাজ হাতে থাকত না, এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ায় রাত্রিবেলাতেও গ্রাম সজাগ। মোটরবাইক ও টেলিভিশন সংস্কৃতি গ্রামের ছবি বদলে দিচ্ছে। গ্রামের মানুষ আজ কমিউনিটি জীবনের বদলে আত্মকেন্দ্রিক জীবন বেছে নিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে রাজনীতি আজ দেশের দশের কাজ না, টাকা কামানোর নীতি। গ্রামে এখন বাংলো ধরনের বাড়ি দেখতে পাওয়া এমন কিছু ব্যাপার না। গ্রামের বিদ্যালগুলোও খড়ের পোশাক বদলে সিমেন্টের পোশাক পরে নিচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগের মতো গ্রামের পথে গরুরগাড়ি আজ আর খুব একটা দেখা যায় না। সাইকেল, মোটর সাইকেল, অটো-গাড়ি, মাইক্রো-ভ্যান, মাইক্রোগাড়ি চলছে। লাঙ্গলের বদলে ট্রাক্টরে জমি চাষ হচ্ছে। স্বচ্ছ-ভারত অভিযানের ফলে রাতের অন্ধকারে বা ভোর রাতে কেউ মাঠে বা জমিতে প্রাতঃকৃত সারতে যায় না। স্যানিটারি টয়লেট বা কমিউনিটি-টয়লেট গ্রামেগঞ্জেও। একদিকে যেমন ভাল হয়েছে। অন্যদিকে গ্রাম হারিয়েছে তার সম্প্রদায়গত জীবন।

পরিবেশ সচেতনতা আসায়, গ্রামের পুকুর ডোবা সংস্কার করে, পাকার ঘাট বানান হচ্ছে। সেজের (SEZ) বা স্পেশাল ইকনমিক জোনের বদলে, ভারতে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা বেশ কিছু অঞ্চলে গেজ বা গ্রিন

ইকনোমিক জোন তৈরি করেছেন। গ্রামের সবুজ বাঁচিয়ে উন্নয়ন। যেখানে শপিংমলের ভোগ্যপণ্যের বদলে গ্রাম স্ব-নির্ভর থাকবে গ্রামে উৎপন্ন ফলমূল, ফুল, সব্জি ও ফসলের ওপরে। বরং সমবায় জীবনে যে ফসল তারা ফলাবে অন্য গ্রামে বা শহরে রপ্তানি করে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার গ্রামে ঘরে আনতে পারবে।

মেশিনে চাষ আবাদ, মেশিনে ধান কাটা, মেশিনে ধান ঝাড়া, ট্রাক্টরে ফসল তুলে আনার ফলে গ্রামে ঘরে গৃহপালিত গরু-ছাগল-মোষের সংখ্যা নিঃচিহ্ন হওয়ার পথে। অবশ্য দিনমজুর এখনো আছে। বিশ্বায়নের গ্রাসে গ্রামের কুটিরশিল্প অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। এক একটা কুটিরশিল্পকে কেন্দ্র করে আগে এক একটা গ্রামের দেখা পাওয়া যেত, যেমন পট-পটুয়ার গ্রাম, ঢোকরা শিল্পের গ্রাম, গালাপুতুল তৈরির গ্রাম, মাদুর তৈরির গ্রাম—এসবেরই দখল নিচ্ছে কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তি। আগে গ্রামের মানুষ অবসর সময় কাটাত নানা চারুশিল্পে ও কারুশিল্পে, বর্তমানে গ্রাম জীবনের সময় একদিকে যেমন টেলিভিশন সংস্কৃতি খেয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে মোবাইল সংস্কৃতি। এই দুই সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রামে মদখোর, গাঁজাখোর, পাতিখোরদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে নারী ধর্ষণ, নারী ট্রাফিকিং-এর সংখ্যাও বাড়ছে। ভোগ্য পণ্যের প্রভাব গ্রাম জীবনেও পড়ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে ভারতীয় গ্রামগুলিতে একদিকে যেমন শিক্ষার আলো পৌঁছোচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। হাত থেকেও কাজ না পেয়ে সেইসব শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে, যা সমাজ অনুমোদন করে না। পঞ্চাশ বছর আগে গ্রাম, গ্রামের মানুষের যে চলমান ছবি আমরা দেখেছি, এই একুশ শতকে আকাশপাতাল বদলে গেছে। সনাতনী প্রথা, আচরণ বিধি, রীতিনীতির, মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে। গ্রাম শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়ে যাওয়ায় শহুরে জীবনের বিষ গ্রামেও প্রবেশ করছে, যেমন—পর্নো-ফিল্ম, ক্যাবারে শো, গ্রামে গ্রামেও এখন ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল ঢুকছে—যতটা না শিক্ষার প্রসারে, তার চেয়ে বেশি বাণিজ্যিক কারণে। অনেক কৃষি সমৃদ্ধ গ্রামে ওয়াইনশপ দেখা যাচ্ছে। লোকসংস্কৃতি ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে জন্ম নিচ্ছে এক হাঁস-জারু সংস্কৃতি। ভারতীয় গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা অদৃশ্য সংঘাত ও মিলন চলছে, ভারতীয় সমাজে নতুন বোঝাপড়ার দিন আসছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুফল হাতে নিয়েও মানুষের মন যদি পড়ে থাকে পাথরযুগে, ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজজীবন থেকে বিষ উঠবে না অমৃত? ভবিষ্যতই বলবে।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

এখন মন দখলের দিন

একটু আগের ভোর ছিল অন্যরকম
এখন যতই বেলা বাড়ছে
ততোই মনে হচ্ছে বেলা যেন
তাড়া করে ফিরছে
এমন একটা ফুলের কথা আমি জানি
যে কিছুতেই ভোরে তার পাপড়ি খোলে না
যতবেলা বাড়তে থাকে
যতই রোদের সঙ্গে তার খুনসুটি
ততোই ধীরে একটা একটা করে
পাপড়ি খোলে
যেন সে ভোরের সোহাগ শরীরে মেলে
খুব মৌতাতে ছিল

এখন ঝলমলে দিন
এখন মন দখলের দিন
এখন প্রকৃতিকে ভালোবাসার দিন

তারপর

১
তারপর বৃষ্টির বিকেল থেকে শুরু হলো
মুগ্ধ কথালাপ
মনে ভাসে কুঞ্জবন নতুন কিশলয়
পড়ে ফেলা দুরন্তদুপুর
এখন কেবলই তীব্র হাহাকার
কার জন্যে তাও বুঝিনা
এখন আটপৌরে সালিসি শুধু
মনে মনে নিষ্ঠুর করাত
এখন শুধুই নিরর্থক উল্লাস আবেগ
অসহ্য মনে হয়
মনে হয় বৃষ্টির বিকেল শুধু
হয়ে আছে মলিন বিধুর

২
এখন কে চায় অনন্ত জীবন প্রকৃতির কাছে
ভয়ার্ত কণ্ঠ আনে বিপুল কৌতুক
কোনো কথা নেই শুধু হাহাকার
যাকে ভালোবাসি সে যেন নিমেষের হাওয়া
সমস্ত রাত্রি জুড়ে শীত আলাপন
এখন সময় থেমে আছে একজন প্রৌঢ়ের গ্রীবায়

আজ সন্ধ্যায়

কখন এসেছি চলে একটুও বুঝিনি
শুধু বুঝেছি
বিদায়ী রৌদ্রের অন্ধকার কখন এসেছে
নেমে
গ্রামীন জীবনে
এসব মুহূর্ত সেই বোঝে
যে জানে একলা বসতে নদী তীরে
শুনতে জলের তারানা
দিনের মন্থরতা নয়
প্রকৃতি সেজেছে আজ হোরীতে
পূর্ণিমার বিহ্বল আলোয়
কোথাও লক্ষ্মী পেঁচা উঠল ডেকে

না দেখা রচনাকাল

রোদের মলাট খুলে
যে পৃথিবী আলোয় ভরে উঠবে
তাকে গ্রহণ করাও
এক ধরনের স্পর্শ
সময় সুযোগ পেলে
হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রামজীবনের গল্পের মধ্যে
একটু না দেখা রচনাকাল
তুমি দেখতে পাবে

দেখতে পাবে
পাতাবাহারের ওপর রঙের খেলা
আবছায়ার মতো কিছু মানুষজনও
দেখতে পাবে
যারা হিমশীতল জীবন হাতে নিয়ে
বসত জেগে আছে

এখন এমন একটা হাওয়া উঠুক
যার পূর্বাপর এই জীবনেই গড়ে উঠবে

বাসব দাশগুপ্ত

গ্রামে, আশ্বিন মাসে

এক
হিমপথ ভিজে আছে সোনালি প্রত্যুষে
নেড়াক্ষেত অজস্র আলপথ এসে
কাটাকুটি খেলে, মোরামের রাস্তা
দিয়ে অচেনা মানুষ আমাকেই খোঁজ করে যায়

আপাত নিরীহ এই দৃশ্যপট পার হয়ে
সর্ষে ক্ষেতের ধারে পরে থাকে স্মৃতি
এইখানে, নির্জন কোপাই জানে
খুন হয়ে গেছে আমাদের সন্ততি

দুই
যতটা নির্জন ভাবো তার থেকে আরও স্তব্ধ
আরও চুপ এই চরাচর। অথচ গোপনে
সব কিছু চলাচল করে, ঝোপঝাড়ে বিষাক্ত
স্বাপদ, নানাবিধ সন্ধিপদী সহস্র চোখে দেখে যায়

গ্রামের ভিতরে বাস করে অন্য এক গ্রাম
অপরের আল কেটে জলের দখল, পুকুরের পানিতে ফলিডল
অজয়ের তীর ঘেঁষে বালি নিয়ে চোরাকারবার
তথাপি আমার গ্রাম, তুমি বল শান্তি অপার

তিন
গভীর দুপুর ব্যাপী একটানা ঘুঘু-র নিশ্বাস
এরকম হয়ে থাকে আশ্বিন আকাশে
অসমান জমি ছুঁয়ে বুড়ো কাশফুল
এসব মলাট-চিত্র, অন্য কিছু গোপন বাতাসে

শান্ত অর্থ শান্তি নয়, লুকানো হিংসা থাকে চুপে
টাঙ্গি চলে, রক্তপাত, শেষ হয় গোরস্থানে, ধূপে

ছুটে আসে টি.ভিয়ালা, দল, রাজনীতি
লাশ দখলের ছুটোছুটি, অতঃপর শহরে মিছিল
নিজের অজান্তে তুমিও চিহ্নিত হলে ওমুক দলের
তথাপি প্রভাত-হিম ডানায় চিলের

সুদীপ দাশ

নিশ্চিন্দিপুর

১

বাইরে গুলির চিহ্ন দেওয়ালের অভ্যন্তরে থমকে নিঃশ্বাস
কাঁচা রাস্তা মোরামে বদলে গেছে
সেচ শ্যালো এখন আগের চেয়ে ভালো
এখনও ধানের ক্ষেত সবুজে হলুদে ঝিরিঝিরি
শুধু মাঝে মাঝে
উঠোনের আমগাছে গোটা দুই চুমু দেওয়া বাতাসের সাথে
একগুচ্ছ মোটরবাইকও ছুটে যায়
মুখ ফস্কে আর কোনও শব্দ নয়
দেওয়ালে গুলির ক্ষত রাতের কপাটে সেই দুন্দার চাপড়
চারিদিকে কত লোক বিশ্বাস ছাড়াই দিব্যি ভিড়ে গেছে
টুটি টিপে বসে আছে কোন গ্রাম?
কোন বাড়ি? কোন লোক? কেন?
বাইরে গুলির চিহ্ন দেওয়ালের অভ্যন্তরে থমকে বিশ্বাস

২

বয়স্ক মানুষ তুমি তোমার হাড়ের ধুলো
আগন্তুকদের দ্বারা পদদলিত হবে—তুমি ভাগ্যবান
এ গ্রামের উত্তরসূরীদের অপমান ভরা দিনগুলোর সাক্ষী
হতে হবে না আর তোমাকে—তুমি ভাগ্যবান

৩

দারুচিনি গাছ আমরা দেখিনি কখনও
দিনগত নুনপান্তা কেবলই হোঁচট খাচ্ছে
পঞ্চায়েত অফিস-দুয়ারে
'টুরিস্ট লজের হাসা মাঝে মাঝে রাতের ঘুম কাড়ে
খোলো খাতা খোলো নাম তোলো
দয়ার ভিখারি আমরা লবঙ্গের তেজ নেই কাছে
দারুচিনি গাছ খুঁজি, এলাচি সুগন্ধ খুঁজি
শুনেছি শুসব নাকি এ গ্রামেই টুরিস্টের ছদ্মবেশে থাকে

সমীরণ কুণ্ডু

ব্যক্তিগত

জন ম্যাকন্‌রো, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, ভিভিয়ান রিচার্ডস, দিয়াগো মারাদোনা, কার্ল লিউইস, মোনিকা সেলেস, শচীন তেন্ডুলকর, মাইক টাইসন, মাইকেল ফেল্পস, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্দো, রাফায়েল নাদাল, উসেইন বোল্ট, শেন ওয়ার্ণ, গ্যারি কাসপারভ, সেন লঙ ও রোমারিও

ধরা গেল এরা সবাই রৈখিক। তুলির আঁচড়ে অথবা কলমে আঁকা ছায়াপথ। আমি প্রার্থনারত আকাশের দিকে তাকিয়ে ফানুস উড়িয়ে বলেছি ওদের ছুঁয়ে এসো।

একটি নয়ানজুলি এত আকর্ষণীয় হতে পারে। জীবন দিয়ে তাকেই দেখছি বিস্ময়ে, প্রজাতির সূক্ষ্ম ছবি ও জল। নিয়মিত দলা পাকাই আবার মেলে দিই। খানিকটা চ্যাপ্টা করা উঠোনের ভিতর মস্তিষ্কের বাহান্ন বছর

শুধ কি তাই, রাত্রিকাব্যে মহাজাগতিক অরণ্যসপ্তাহ এল একবার। মেঘের দানা ভেঙে জল বের করছিলাম। নৈঃশব্দ্যের অহংধ্বনি গুপ্ত নিরীক্ষণে ছিল। কালো শামিয়ানা মাথার উপরে না থেকে পাশে দাঁড়িয়ে। ঋণ চাইলাম। জন এসে বলল, আগুন জ্বালাও। তারপর ওরা সবাই একে একে প্রাগৈতিহাসিক বীর্য দিয়ে যুদ্ধের বার্তা ছড়িয়ে গেল। প্রায় একশো একাত্তর ঘন্টা পেরিয়ে যখন সকাল হল ষোলো রকমের ফুলের ঘ্রাণ।

একক কবিতা

চয়ঞ্জীব শূর

সিভিলাইসড মেটামর্ডানিটির নিচে,
সোনালী ঢেউয়ের কবর
কংক্রিটের ফাটল বেয়ে লতিয়ে আছে—
সবুজ রঙের অবুঝ বন্যতা
যদিও তার হিংস্রতা নিতান্তই মূল্যহীন ঠাণ্ডা মগজের ঘিলুতে।
তবুও সে স্বপ্ন-জাতকী, রামধনুর সপ্তরথীরা
দেখেছে তার সালোকসংশ্লেষ ...
আবেগ জাপ্টে বেঁচে থাকার লড়াই।
সে ধূসর ভীতের শক্তিশেলে—
রাতের আকাশের নিয়নের গল্প বিশল্যকরণী,
বাঁচিয়ে রাখে কয়েক প্রজন্মের ঘুম—
যাদের চোখের উষ্ণ-প্রস্রবণে
ভগবানের নরকবাসের শাপমুক্তি,
তাদের প্রাণশক্তি কেড়েছে জিওন, যখন
দৈনন্দিনতার বিছানায় পরে—
দাবানলের শেষ নিঃশ্বাস।
জটিল থেকে গাণিতিক জীবন নয়ত যাপন;
ঠিক যেমন বিবর্তনে টিকে থাকা এক চিলতে
বর্বরতা ফাটল ধরিয়েছে,
তার গল্পেই বেঁচে থাক, পূর্বপুরুষের সমাধিস্থ দেহাবশেষ,
উত্তরের আঁতুড়-স্পন্দন ...

স্বাতী গুপ্ত

গুচ্ছ কবিতা

নিসর্গ-১

ত্রয়োদশী চাঁদ আকাশের গায়ে
আঁধার আসে জোনাকি আলোয়

ভাদ্রর শিশু ধানের ক্ষেতে
আগামীর উচ্ছল ঘোর

পাকা ফসলের গন্ধের
নিকানো উঠোনে অপেক্ষার প্রহর

তুলসী তলায় ধুপের ধোঁয়ায়
জমানো অনিশ্চয়

এক প্রহর ঘুম শেষে
আলতো আবেশে সোনালি স্বপ্ন

অতি ধীর পায়ে কিছু জীবন
নাগরিকতার যোজন দূরে
এখনও জোগায় রসদ ...

নিসর্গ-২

নীল সন্ধ্যা ধীর পায়ে এসে দাঁড়িয়ে
ক্লান্ত শরীরে হাত বাড়ায়

ঝিঁঝিঁর ডাকে নিস্তব্ধতা জমাট
পাঁজরের খাঁজে লুকানো স্পর্শ গুলো
ভাদ্র আকাশে তারা হয়ে জ্বলে

বহু পথ পার করে এলোমেলো হয়ে
স্বচ্ছতোয়া বালু চরে কৃশ কায়া
তবুও পিয়াসি মনে স্নেহ ধারা

নিঃশব্দ প্রহর অনিবার্য প্রতীক্ষা
পাখিরঙ ভোরের পরিপূর্ণতা
ছুঁয়ে যাবে কালো রাতের মৌনতা।

নিসর্গ-৩

যন্ত্রণাগুলো চেপে সময়ের সাথে
চল ফিরে যাই আরও একবার
ফেলে আসা পথে

যেখানে আগাছায় ভরেছে সাজানো বাগান
মালতী কুঞ্জে এখনও বুলবুলির গান

ছোট নদীটা আজও একই আছে
সেই পথে
মিঠে চায়ের ফুলের গন্ধ জড়িয়ে
প্রতি বাঁকে

সময় যখন ক্লান্তি নামায় আকাশটির
গন্ধ মাখি চল দুই হাতে ...

নিসর্গ-৪

আতপের তীক্ষ্ণ তাপের অবসানে
নীল সন্ধ্যা ধীর পায়ে এসে দাঁড়িয়ে
ক্লান্ত শরীর হাত বাড়ায়

ঝিঁঝির ডাকে নিস্তব্ধতা জমাট
পাঁজরের খাঁজে লুকানো স্পর্শগুলো
ভাদ্র আকাশে তারা হয়ে জ্বলে

বহু পথ পার করে এলোমেলো হয়ে
স্বচ্ছতোয়া বালুচরে কৃশ কায়া
তবুও পিয়াসি মনে স্নেহ ধারা

নিঃশব্দ প্রহর অনিবার্য প্রতীক্ষা
পাখিরঙ ভোরের পরিপূর্ণতা
ছুঁয়ে যাবে কালো রাতের মৌনতা।

উপন্যাসে যা লিখিনি

শুভংকর গুহ

এপাশে গ্রামজীবন, ওপাশে প্রান্তিক জীবন। মধ্যিখানে মাদুরের মতন পড়ে থাকা চোত মাসের ধানমাঠ। বাসাঘর শহর কলকাতায়, চৌকাঠে পড়েছিল বাউলমন, কুড়িয়ে এনেছি, মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে। যাত্রা শুরুর সূচনায় ভেবেছিলাম, গ্রামের নাম যদি পাখিরঙ বা মাছরঙ হয়, তাহলে, গ্রামের নামের সাথে স্বপ্নের ছোঁয়া জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু না, পশ্চিমবাঙলায় অনেক গ্রামের মতন, নাম নবগ্রাম। গ্রামের চৌমাথায় নামলাম, দুপুর, মেঠো রাস্তায় পায়ে জড়িয়ে গেল নালি ঘাস। ছোটাখাটো আকারের অশোক মন্ডল, আমার ছায়াকে অনুসরণ করে, মোটর সাইকেলের ব্রেক কষে দাঁড়াতেই, চোতের ধুলো উড়ল, সাথে মাঠ-প্রান্তে ঘুঘুর একটানা ডাক দুপুরপ্রান্তে নবগ্রাম মোড়ে তেলেভাজার দোকানে, ক্লান্ত পোড়াকড়াই। কয়েকটা তেলেভাজা তখনও নেতিয়ে কাঁসার থালার এক কোণে। চায়ের দোকানে, তেলেভাজার দোকানে, চোতের তাপে বেঞ্চিতে বসে, কয়েকজন গ্রামবাসী ধুকছে, আর নবাগত আমাকে দেখছে, অশোকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নসূচক হাসছে। গ্রামে এমনই হয়। পরে জেনেছিলাম তিনি, শিক্ষক এবং নাট্যকার। তিনিই এগিয়ে এসে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। অশোক উৎসাহিত হয়ে বলল—দাদা, উনি আমাদের গ্রামের নাট্যকার। উনি নাটক লেখেন, সম্পর্কে আমার কাকা হন, ওনার লেখা নাটক আমরা মঞ্চস্থ করেছি।

নাট্যকার কাকা আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। অশোক বলল, গ্রামে যেমন হয়, সেইভাবেই বলল, আমি তো অবাক। অশোক একী বলছে? এত বৃহৎ পাঠক বাজারে, আমার সেই অর্থে কোনো পরিচিতিই নেই। অশোক বলল, নাট্যকার কাকাকে যতদুর যত্ন করে জানানোর, জানালো। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম অশোকের নাট্যকার কাকা সব বিশ্বাস করছে, কিছুটা এগিয়ে যেতেই, দেখলাম ভাঙা কাঁচের টুকরোর মতন একটি পুকুর পড়ে আছে। জল টলটলে। পাতিহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। পুকুরপারে সজনে গাছের সারি। ফুল এসেছে। বাতাসে একটা চাপা গন্ধ। তার সাথে পুকুরের জলের নিজস্ব গন্ধ। পুকুরের মাছ-পোনা ভেসে ওঠার চঞ্চলতা অতিক্রম করে, অশোকের বাড়িতে, পুকুরের ওপারে গ্রাম-জীবনের বাড়ি-ঘর। পশ্চিমবাঙলার অনেক গ্রামের মতন, এই নবগ্রাম। ধনী, চাষী, ভাগ চাষী, ক্ষেতমজুর, দোকানদার, গাড়োয়ান, গ্রামীণ মাস্টারমশাই, রাজনৈতিক মাতব্বর, হিদু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের বসবাসের কেন্দ্রস্থল এই নবগ্রাম। বহরমপুর স্টেশন থেকে মাত্র এক দেড় ঘন্টা বাসের পথ। সাগরদিঘির উত্তরদিকে। ফসলের জমি এখন যেন চাদর পেতেছে। গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি বেদে পাড়া আছে। সাপুড়িয়া বেদেরা থাকে। আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার কেন্দ্রভূমি ঐ বেদে পাড়া। অশোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল, দূরভাষে, কলকাতা থেকেই। নবগ্রামে এসে এই প্রথম সরাসরি। বিশ্রামের অবসরে অশোক আমাকে বেদেপাড়াতে নিয়ে যাবে। আমি বেদে সাপুড়িয়া বলছিলাম। অশোক বারে-বারে, কিন্তু মাগানতা কথাটি বলছিল। আমি একসময় জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। বললাম, মাগানতা বলছ কেন? অশোক বলল আমরা মাগানতা সাপুড়িয়া বলি।

কেন?

বেদেরা নিজেদের তাই বলে, অশোক বলল।

এতদিন তো বেদে বা বেদিয়া জানতাম।

অশোক উত্তর দিল, —হ্যাঁ ঠিকই তো জানেন। ওই কথা ভদ্র সমাজে প্রচলন আছে। কিন্তু ওদের সমাজে, ওরা নিজেদের মাগানতা বলে। মাগানতা কথার অর্থ হল যারা মেঙ্গে, চেয়েচিন্তে, বা সাধারণ ভিক্ষাবৃত্তি বা চাওয়া পাওয়ার মধ্যে দিয়ে জীবিকার্জন করে। সাপকে ওরা মোশেল বলে। আর সাপের গর্তকে বলে বিয়োর।

'বিয়োর' চমৎকার শব্দ। মনে দাগ কেটে দিল। ডাকমাস্টার যেন চৌকাঠে চিঠি হঠাৎ ফেলে গেল। সাপের গর্ত। কতদিন এই প্রসঙ্গে আলোচনা হলেও, এত অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। চমৎকার লাগল শুনতে। ভেবেছিলাম; সাপের গর্ত বোধ হয়, সহজে দেখা যায় না, কিন্তু অশোক ধানমাঠের দিকে আঙুল তুলে জানিয়ে দিল, গ্রামজীবনের মাঠপাশে বিস্তর সাপের গর্তের ছড়াছাড়ি, ইতস্তত সাপ মানে মোশেলের চলাচলের দাগ। চমকে উঠলাম, যখন বলল, বড়ই সরল প্রাণী, বুদ্ধিহীন প্রাণী, একেবারে নিরীহ। সারাজীবন বিষ নিয়ে থাকে, কিন্তু প্রয়োগ করে না।

কি বলছ অশোক?

হ্যাঁ, দাদা, নবগ্রামের আশেপাশে, মাঠ বিস্তরে সাপ গিজ-গিজ করছে। কিন্তু কটা সাপ গ্রামবাসীদের কামড়ায় বলেন তো? কামড়ায় না। বিরক্ত করলে কামড়ায়। আবার ভয়ে কামড়ায়। আর অধিকাংশ বিষহীন। আর যে সব বিষধর কামড়ায়, অধিকাংশ ঠিক মত কামড়াতে পারে না। সাপের কামড়ে যারা মরে, অধিকাংশই ভয়ে মরে যায়। আমাদের গ্রামে গ্রামবাসীদের অনেকটা সচেতন করে তুললেও, সাপ দেখলেই সচেতনতার কথা ভুলে যায়। আমি আপনার গলায় বিষধর ঝুলিয়ে দেব, কেউটে বা গোখরো, দেখবেন আপন ভেবে কেমন আপনার গলায় ঝুলে থাকবে।

আমার এমন আপনজনের প্রয়োজন নেই অশোক ভাই? —আমি তীব্র বিরোধ করে, প্রায় উচ্চস্বরে বললাম, আমায় এমন আদর কোরো না, যে আদরের পাল্লায় পড়ে আমার জীবনযন্ত্র লাট খেয়ে না যায়?

অশোক হাসল, তারপরে বাড়ির উঠোনে, লাউমাচার কাছে নিয়ে এল। পাশাপাশি আরও নানান লতাপাতার জমায়েত, কুমড়ো ওধারে, মাটির দেওয়াল ধরে, জড়িয়ে, চোত মাসের তাপে বিভোর। অশোক চোখে-চোখে ইশারা করল, আমি স্বাভাবিক ভাবে বললাম;

লাউমাচা।

অশোক মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ টানে বলল,— ব...টে...

হ্যাঁ তাই তো? সাদা পাতার আখ্যানে কে যেন, জাদু বাস্তবতা ঢেলে দিচ্ছে? স্থির, চোখের পলক পড়ছে না, আমি এতটাই অবাক যে, লাউমাচা আবার নড়ে নাকী? দেখছি লাউগাছের ডগা পাশাপাশি নড়ছে, পাঁচিল-রোদ পাশে কখনো কখনো কুমড়োর ডগার পাশে ঝাপিয়ে পড়ছে। গাছ নড়ছে। গাছ সরিসৃপ হয়ে গেছে। অশোকের বাড়ির উঠোনে লতাপাতা চলমান ভাবুক হয়ে গেছে। পাশ ফিরে নড়ে টড়ে কাব্যরচনা করছে। আমার মনোযোগে অশোক হঠাৎ যেন, আলতো আদুরে ধাক্কা দিল।

দেখছেন তো? লাউগাছ নড়ছে? বেদেপাড়ার সর্দার, মীরু সাপুড়িয়া এখনই আসবে, আপনার সাথে কথা বলতে, এইভাবে দেখলে হাসবে।

আমিও যথাযথ বোকার মতন, বলেই ফেললাম—আমি তোমার মতন ডগা বিশেষজ্ঞ নই। তোমরা গ্রামে থাকো, প্রকৃতির টুকিটাকি দেখতে পাও। আমাদের ওখানে কোথায় লাউমাচা?

অশোক বলল, দাদা ওগুলো লাউডগা সাপ। আপনার ভুল স্বাভাবিক।

আমি বললাম, সত্যিই লাউয়ের ডগা যদি এত স্বচ্ছ সবুজ হত, তাহলে লাউগাছ আরও সুন্দর হত। কিন্তু উঠোনে এমন সাপ নিয়ে বসবাসের কোনো মানে হয়?

রয়েছে, থাকুক। শুঁয়ো পোকার মতন আসে, থাকে চলে যায়। জড়িয়ে থাকে আদরে। ফাল্গুনের শুরুতেই আসে, আষাঢ়ে ফিরে যায়। নিরীহ, ফণা নেই, বিষও নেই। কিছু পেলে শুধু জড়িয়ে যায়। সাপুড়িয়ারা ধরে না। আমি তো সাপুড়িয়াদের ঝাঁপিতে কোনোদিন দেখিনি। আমাদের নবগ্রামে এই কয়েকটা ঋতুতে বেশ দেখা যাচ্ছে।

আমার তো ধারণা ছিল বিষধর।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলাম। অশোক সাপ ধরতে জানে। বেদেদের মাগুতা ভাষা জানে। আচরণ জানে, সংস্কৃতিও জানে, জানে সাপখেলার নমুনা। সেও নাকী মাগানতা সাপুড়িয়াদের সাথে বিচরণ করে, খেলা দেখায়, মা মনসার নামে শপথ করে, গ্রামের মঙ্গল কামনা করে। চৈত্রের দুরন্ত রোদ, বেলা না গড়ালে পড়বে না। তাপও কমবে না। অশোক পাতলা লিকার চা দিয়ে বলল, স্নান করে নিন। জানালা দিয়ে চোখ মেলে, বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, সম্পূর্ণ নবগ্রাম, চৈত্রের তাপে ধুকছে। হাওয়া-বাতাসে, আগুনে উষ্ণতা। জানালার ওপাসে নির্জন গ্রামচিত্র, পুকুরে জল টলটল। পারে গ্রামজীবনের কাজ চলছে। জলে হাঁস ভাসছে। স্নান করলাম, শীতল জলে শরীরে আরাম এল।

বিকালের দিকে রোদ পড়ে এল। আকারে লম্বা হল, নিস্তেজ হয়ে গেল। অশোকের বাড়ি থেকে, নবগ্রামের বেদে পাড়া দেখা যায়। আমরা চৌকাঠ পার হয়ে, ভাবনার সব আয়োজন ফেলে দিয়ে, এই প্রথম কোনো সাপুড়িয়া বেদে পাড়াতে প্রবেশ করলাম। উঠোনে প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে দিল। সর্দার এল। মীরু সাপুড়িয়া। অশোক মীরু সাপুড়িয়াকে বলল,—

খুব যে এলে?

যেতাম। বহরমপুর থেকে, মজমা করে ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল। এই তো ছেমলোর ঝোল দিয়ে ভাত নিলাম। গরশ নিলাম। মুখ যে বিষ হয়ে আছে। অশোকদা যাতায়াতে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে বরাবর। সাপের ঝাঁপি দেখলে, পুলিশে ছাড়ছে না। কিন্তু কি করি বলেন তো?

কলকাতা থেকে দাদা এসেছেন, তোমাদের সাথে কথা বলবে বলে, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেই চলে এল তোমার পাড়াতে।

তা বাবুকে পোক্করের ঝোল-ভাত দিলেন?

পোক্করের মাংস তুমি আনবে। রাত্রে ভোজন হবে। তুমিও খাবে।

আমার নাম মীরু সাপুড়িয়া। নমস্কার নেবেন বাবু।

আমিও নমস্কার জানিয়ে বললাম, অশোকের মুখে তোমার নাম অনেক শুনেছি। তোমার কথা শুনেছি।

আর খেতে না পাওয়া, ভিখারিরও অধম সাপুড়িয়ার কথা জেনে কি করবেন? সন্ধ্যাবাতি দেওয়ার মতন অনেক কথা ও গল্প ছড়িয়ে আছে। আমাদের কথা জানলে বাবু আপনি অস্পৃশ্য হয়ে যাবেন। আমাদের হাতে পানি তো দুরের কথা, ছায়া ছোঁয় না। আপনি এলেন, মাগানতা বিয়োর ধন্য হয়ে গেল।

আবার সেই সুন্দর শব্দের উচ্চারণ 'বিয়োর'। আমাকে মীরু সাপুড়িয়া চেয়ারে বসতে বলে, চমৎকার শব্দের উপহার দিল। অশোক আগেই বলেছিল। বিয়োর শব্দের অর্থ হল গর্ত।

মীরু সাপুড়িয়া উঠোনের মাটিতে গামছা পেতে বসল, হাঁটুতে ভর দিয়ে, অনেকটা নামাজ পাঠের ভঙ্গিতে, বলল, নানান কথা, মাঠ ভাঙা এক দার্শনিক যেন, বলতে থাকল—

বেদে সাপুড়িয়ার ছেলে আমি। মাগানতা সন্তান। জীবন আমাদের আগা-পিছন নিয়ে। পিছন তুলে বাঁচি। আগা তুললে সামলে নিই।

আমি অশোকের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালাম। অশোক বুঝতে পারল। মীরু সাপুড়িয়া কথার শুরুতেই অর্থাৎ কথার নদীতে নেমেই যেভাবে লগি সামলে নিল, সেই কথার অর্থ বোঝা আমার মতন ছা-পোষা শহরবাসীর সম্ভভ নয়। মীরু থেমে গেল, বুঝতে পারল বোধ হয়, আমরা ওর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি না। কিন্তু তা কেন? আমি যে সাপুড়িয়ার কথায় কতটা উৎসাহিত বোধ করছি, অশোক তা বুঝিয়ে দিয়ে এবারে বলল— দাদা মীরু সাপুড়িয়া একেবারে সাপুড়িয়া ধর্মের কথা বলছে। আগা এবং পিছু নিয়ে ওদের জীবনপ্রবাহ আর কারবার। ওরা তাই মনে করে, আমরা যেমন পুঁথিরদাস ওরাও তেমনি, ডগা পিছুর দাস। মাঝখানে শুধু শক্তি আছে, সেই শক্তির শুধুমাত্র বাঁধন দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না। দুইজনেই ওরা কি বলতে চাইছে?

অশোক এবার পরিষ্কার করে দিল। অশোক বলল—একবার ভাবুন সাপের শরীরের কথা। সাপুড়িয়া বোঝাতে চাইছে, ফণা এবং লেজের কথা।

মাথা দুলিয়ে মীরু সাপুড়িয়া বলল,— আগা ফণা তোলে। আগায় বিষ দাঁত আছে। আগা ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলায়। আমরা উপার্জন করি। মানবজাতির যত ভয় ওই আগা নিয়ে, আর আমাদের উপার্জন ওই ফণা নিয়ে। সেই ছেলেবেলা থেকে, কথা বলতে শেখার আগে ফণা চিনলাম। ফণা ডাইনে দুললে ঝাঁপিতে টাকা পড়ে-পয়সা টং করে শব্দ দিয়ে গড়িয়ে যায়। বাঁয়ে দুললে, কদু পড়ে, বাটিতে চাউল দেয়। ফণা গুটিয়ে বসে থাকলে, গ্রামবাসী মাথায় গামছা ফেলে দেয়। আগার মাহাত্ম্য অনেক। ফণা আমাদের রুটি ভাত, ফোঁস আমাদের জয় মা মনসা। আপনেরা বাবু সভ্য মানুষ। ভয় পান গর্তকে। আর গর্তে আমাদের জমা থাকে উপার্জন। সাপ থাকে গর্তে। গর্তকে আমরা বিয়োর বলি। এই গর্তেই মোশেল থাকে। মোশেল বিয়োর।

মীরু সাপুড়িয়া মোশেল কথাটি এমনভাবে বলল, সাপ যেন এক মহাশয়। সাপের যেন এক জ্যাঠামি ভাব আছে। সাপ সত্যিই এক জেঠু প্রকৃতির। যে বেদে সংসারে থেকে অভিভাবকের কাজ করে। কত সাপের ওপরে জীবনে মায়া পড়ে গেল। বুড়ো হয়ে গেল, মাঠে ছেড়ে দিলাম। সাপুড়িয়ার কথাগুলি মনের গভীরে বসে যাচ্ছিল। প্রতিটি মানববোধের গভীরে দাগ থাকে। কিন্তু সেই দাগের মধ্যে কোনো কথাই যেন বসতে চায় না। মীরু সাপুড়িয়ার কথাগুলি মনের দাগের ভিতরে বসে যাচ্ছিল। আত্মতৃপ্তি যেন উপছে পড়ে যাচ্ছিল। মীরু সাপুড়িয়া বলল,— বুড়ো সাপ বেদে সংসারে থাকতে থাকতে খাপতে হয়ে গেল। বাবা হয়ে গেল। আচ্ছা বলেন তো বাবু? খাপতে মানে বাপ বুড়ো হয়ে গেলে আমরা কি মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসি? তাহলে যে সাপ সারা জীবন উপার্জন দিল, মাঠে কেন ছেড়ে দিই? মানবজাতি এমনই। ব্যবহারে-ব্যবহারে সুমিষ্ট চিনির পুতুলকে পর্যন্ত শেষ করে দেয়।

কথাচ্ছলে মীরু সাপুড়িয়া বড়ই দামী কথা বলে দিল। শহরজীবনে রোজই দেখি উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদের কী ভয়ানকভাবে ব্যবহার করে। ক্ষমতাশালীরা চিরকাল জীবজগতেও অন্যায় আচরণ করেছে। বেদে সাপুড়িয়ার চমৎকার এই স্বীকারোক্তি দূর দিগন্তে মায়াবী ছায়া ফেলে দিয়ে গেল। সাপের প্রতি মীরু সাপুড়িয়ার সহজাত প্রেম যেন মানবিক বন্যতাকে তীব্রভাবে বিরোধ করল। আমরা যেখানে সাপ দেখি, ভাবি সর্বনাশ হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লাঠি হাতে নিয়ে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হই। মীরু সাপুড়িয়া সম্পূর্ণ ভুল ভেঙে দিল।

ভাবেন তো? জীবজগতের সবচাইতে উন্নত মেরুদন্ড প্রাণী হত্যা করে সৃষ্টি কর্তার সব চাইতে দুর্বল মেরুদন্ডহীন প্রাণীকে। সবচাইতে ভীরু প্রাণীকে কি অবলীলায় নাচিয়ে বেড়ায়। জীবজগতে কোন প্রাণীর বিষ নাই। কারও বিষ মনে থাকে, কারও থাকে দাঁতে। তবে দাঁতের বিষ থেকেও মনের বিষ অনেক বেশি ভয়ংকর। সাপের মন নাই। কিন্তু মানুষের মন আছে।

মীরু সাপুড়িয়ার কথার সাথে আমার কল্পনায় গড়ে উঠছিল আখ্যান আর বেদেপাড়ার চিত্রকল্প। যেন সাপের ঝাঁপির ভিতরে ঘুমিয়ে আছে আমার কাহিনি। সেই কাহিনির ঘুম ভাঙছে আস্তে-আস্তে। মীরু সাপুড়িয়াই ধরিয়ে দিল, সুচনায় বাগান কিভাবে সাজাবো।

এই বেদে পাড়া করে থাকতে গিয়েই তো, সর্বনাশ হয়ে গেল মাগানতা জাতির। শিকল বাঁধা হয়ে গেল, বিচরণ ধর্মের। বেদে জাতির উনান কেন একস্থানে থাকবে? বেদে জাতির রান্নার স্থান থাকে না। রান্নাঘর থাকে না। সেই আমরা পাড়া করে, রান্নাঘরের ফাঁদে পা দিলাম। সর্বনাশ হয়ে গেল, বেদে ধর্মের। বিচরণ করে বেড়াতাম। আমার জন্ম তো মপলোর মধ্যে হল। তখন দল চলেছে, পায়ে হেঁটে, মপলোর মধ্যেই বেদেনি আমায় প্রসব করল। দল চলেছে, ছইয়ের মধ্যে মা বেদেনি, প্রসবের কাজ করল অন্য এক বেদেনি। বেদে দল থামে না। এক গ্রাম থেকে, অন্য গ্রামে, অন্য প্রান্তে। দল শুধু থামে রাতে, একটি গাছের নীচে, বিশ্রামের জন্য। পাশে জলাশয় থাকলে আরও ভালো। বেদে জাতির তো এই নিয়ম, এটাই ধর্ম। আমরা সেই নিয়ম ভাঙলাম।

আমি বললাম, কেন? ছয় মাস তো গৃহেই থাকো না?

কেন? ঠিকানা যে রয়ে যায়? নবগ্রামের বেদেপাড়া। যতই বিচরণ করি, ফিরে আসার ঠিকানাতো এইখানেই। মানুষ একবার ডেরা বাঁধলে, ঠিকানা তার পিছু ছাড়ে না। বিচরণের শেষে রাত্রে, আপনের ফেরার জন্য কোনো স্থান থাকবে না, আপনার যাত্রা যেমন উদ্দেশ্যহীন ফেরাও

উদ্দেশ্যহীন হতে হবে, তবেই না বেদে জীবন ফাল্গুন মাসের মতন সুন্দর হয়ে উঠবে। কি বাবু? ঠিগ তো?

মীরু সাপুড়িয়ার কথা ঠিক কি ভুল, তা নির্ধারণ করার অধিকার আমার নেই। আমি ছা-পোষা এক শহুরে মধ্যবিত্ত। শহুরে জীবনের সমস্ত সুবিধা উপভোগ করে, অবশেষে আসন পেতে বসে আছি মীরু সাপুড়িয়ার সামনে। কতবার যে আমার লালিত, আমারই মধ্যবিত্ত অহংকার ধাক্কা খেল? সত্যিই জীবন এক বিচরণ, শিশু অবস্থা থেকে যৌবন, মধ্যবেলা থেকে প্রবীণ অবস্থা, সে তো এক বিচরণ শুধু। মীরু সাপুড়িয়া যেন আস্তে-আস্তে আমার আখ্যান রচনার সমস্ত দুয়ার খুলে দিচ্ছে। মোশেল বিয়োর অর্থাৎ সাপের গর্ত, রান্নাঘর, বিচরণ, ঝাঁপি—এই সমস্ত শব্দগুলি আমার কাছে খুব অর্থবহ হয়ে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম, শব্দগুলির সাথে আমার একপ্রকার বোধ জন্ম নিচ্ছে। রান্নাঘর এবং সাপের গর্ত আমার কাছে এই দুটি শব্দ খুবই অর্থবহ হয়ে উঠল। আমার ক্ষেত্র সমীক্ষাকে ক্রমশ বিবরণধর্মী করে তুলতে সাহায্য করছিল।

মীরু সাপুড়িয়া হঠাৎ গ্রামীণ মাস্টার মশাইয়ের সুরে বলে উঠল, বাবু সাপ ধরতে পারেন? সাপ খেলা দেখেছেন?

আমি বললাম, সাপ খেলা আমি বহুবার দেখেছি, সাপ মেরেছিও, প্রতিবেশীকে সাপে কামড়েছে, হাতপাতালে নিয়ে গেছি, সাপের উদ্যান দেখেছি, কিন্তু সাপ তো কোনোদিন ধরিনি।

চলেন আমার সঙ্গে সাপ ধরবেন।

কি বলছ কি? সাপ ধরব, তোমার সাথে?

চলেন, আমার সাথে। সাপও ধরবেন। খেলাও দেখাবেন। আমি শিখিয়ে দেব। সাপ নিয়ে লিখবেন আর হাত দিয়ে সাপ ধরবেন না, তা হয় নাকী?

মীরু সাপুড়িয়া এই কথা বলে, ঝাঁপি খুলে, মস্ত আকারের গোখরো হঠাৎ আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল। আমি চমকে উঠলাম। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। আমার করার কিছুই ছিল না। অসহায়। মীরু সাপুড়িয়া পাকা, খোচা-খোচা গোফের অন্তরালে হাসছে। চোখের ভাষায় যেন বলতে চাইছে, —সাপ নিয়ে লিখতে এসেছেন, ভয় পাচ্ছেন কেন?

কি করে হয়? যে গোখরাটা আপনার গলায় ঝোলালাম, এটা এই নবগ্রাম বেদে পাড়ার সবচাইতে প্রাচীন সাপ। ওর নাম পয়গম্বর। ওই সাপ পয়গম্বর মোশেল, বেদে পাড়ার সর্দারের একমাত্র দোসর। এই সাপ আপনের গলায় ঝুলিয়ে দিলাম, আপনের মঙ্গল হবে। মা-মনসার দয়ায় আপনার দুয়ার থেকে অমঙ্গল বিদায় নেবে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে, অশোক মন্ডলের চাপা হাসি, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, সাপুড়িয়া এবং অশোক মন্ডল, এরা দুজনেই আমাকে প্রগাঢ় ঠাট্টা করছে। মীরু সাপুড়িয়া বুঝতে পারছিল, আমার দমবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। গোখরো মানে ও ওর পয়গম্বরকে আমার গলা থেকে মুক্ত করে আমাকে বলল,

সাপ নিয়ে লিখবেন, অথচ সাপ ঘাটবেন না, তা কি করে হয়?

আমি সাপুড়িয়াকে বললাম—আমার লেখার বিষয়—সাপ নয়, সাপুড়িয়া।

মীরু সাপুড়িয়া আহ্লাদে বলল, বেদেনি বড় সুন্দর রান্না করছে। মশলার গন্ধ পাচ্ছেন বাবু? পোক্কর রান্না করছে।

সত্যিই আমার সামনে রান্না উপাদান অনেক। কলকাতায় ফিরে গিয়ে রান্না করতে বসতে হবে। কিন্তু কোনটা আগে রান্না করব সেই ভেবেই আকুল হলেও, অথচ লেখাটা খুব জরুরি ছিল।

উপন্যাস 'বিয়োর' প্রকাশিত হওয়ার পরে, আজ লেখাটি গড়ে ওঠার কথাটি ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যত দিন যাচ্ছে, কোনো ঘটনাই ঠিক-ঠিক মনে থাকছে না। অতীত খুব দ্রুত ধূসর হয়ে যায়। দূরে সরে যায়, রান্নাঘরের অন্দরমহল।

সঙ

তন্বী হালদার

(১)

আয়ানের খোকাটাকে দড়ির দোলন দিতি কৃষ্ণের খুব বিড়ির তেষ্টা পায়। কিন্তু সামনে ফুঁক ফুঁক করি ধোঁয়া ছাড়া মোট্টে ভালো কথা নয়। কৃষ্ণের মনে অনেক চিন্তা। এবার দোলে খুব বেশি বায়না হয়নি তাদের। গেল বারেও ফাল্গুন, চৈত্র দুটো মাস ধরে ফি দিনই বায়না ছিল। দম ফেলার ফুরসৎ ছিল না। অবশ্যি এজন্যি কৃষ্ণ মনে মনে বেশ খুশিই। ঐ টুকুন ছেলেডারে নে এ প্রান্তর ও প্রান্তর করি বেড়ালে বাছার শরীল টিকতোনি। আয়ানের বৌ বাচ্চা বিইয়ে সাড়ে তিন মাসে ভেগে গেছে। উফ বাপরে বাপ তারপর থেকি কি সেগোস্তো। বাছা তো বুকের দুধের নেশায় টাস দে কাঁদে, আর আয়ান বিড়ির খোলে গাঁজার পুরিয়া ভরে দম দে এ জগৎসংসার থেকি ভোঁকাট্টা হয়ি আছে। রাধুটা তো জন্মহারামী। এদ্দিন দলের সুঙ্গি আছে, অথচ কারও প্রতি কোনো টান নেইকো। সত্যভামা, রুক্মিণী, বিশাখা, ললিতা যখন যাকে পাচ্ছে তার সুঙ্গি ঢলাঢলিতে মেতি আছে। আর ওরাও হয়েছে তেমন 'রাধুদা' বলতি অজ্ঞান। শয়তান। মনে মনে চার অক্ষরের একটা খিস্তি দেয় কৃষ্ণ। যত জ্বালা হয়েছে এই কৃষ্ণের। দু'বেলা পাত পেরে সব কি গিলবে, তার থেকি কোথায় কখন কি পালার বায়না হবে সব হিসেব রাখতি হয় তাকে। এখন অবশ্যি আয়ানের এই ছোট্ট ছেলেডা সব সময় তার বুক জুড়ি আছে। কৃষ্ণ ওর নাম রেখেছে সুদর্শন। তবে আদর করবার সময় 'লাট্টু' বলেই ডাকে। তা সে লাট্টুর মা ভেগে যাওয়ার পর আয়ান ঠিক করেছিল, বেড়ালের বাচ্চার মতো কোথাও একটা ফেলে দে আসবে। তখন রুখে দাঁড়িয়ে ছিল এই কৃষ্ণই। মঞ্চে যেমন করে কালীয় নাগের মাথায় চেপি তাকে বধ করে, তেমনি করে আয়ানের টুটি চেপি ধরেছিল। গর্জে উঠেছিল, 'খপরদার আমার জান থাকতি এ কম্মর কথা ভেবেছিস তো জ্যান্ত পুঁতি ফেলবানে'। মঞ্চের ওপর এক মাথা কোঁচকানো ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে কৃষ্ণ যেমন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে সেদিন তেমন ভাবেই সে অবতীর্ণ হয়।

এ দলের হেড হচ্ছে কংস। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরি তার শরীরের নানা ব্যামোর জন্যি সে খাবি খেয়ে যাচ্ছে। ওর মাথাতেই প্রথম আসে দলে অন্তত একডা ফিমেল থাকা দরকার। নারকেল মালার ওপর ব্রেসিয়ার

পরে মেয়ে মানষের ঠমক এখন আর পাবলিক খায় না। রাধুর সঙ্গি সে নিয়ে প্রচুর ফাইটিংও হয়েছে। আর তখনই আয়ান শালা একডা ধেড়ে ছুড়ীকে কোত্থেকে নে এসে বলে, 'গাঁ থেকি নে আলাম গো। আমার বৌ। বে করেছি মন্দিরতলার কালীমন্দিরে। ধম্মস্বাক্ষী মেনি। নেও ইবার পড়েপিটে নাও।' এত খচ্চর একিবারে বৌ করি নে আলে যাতে আর কেউ হাত না বাড়াতি পারে। তবে একদিন ঐ বে'র জন্যি জব্বর খাওয়া দাওয়া হয়িছিল। কেন জানি কৃষ্ণের প্রেথম দিনই মনে হয়িছিল, 'এ মাল জাত সরেস, এর মাল টিঁকবে নি'।

আয়ানের বৌটা প্রেথম থেকিই কংসের গা ঘেঁষা ছিল। পুর্ণিমা, অমাবস্যায় ইছামতীর জলের সুঙ্গি পাল্লা দে যখন কংসের বাতের ব্যথায় পা ফুলে থোড় হত তখন সরষের তেল, কালোজিরে রসুন দে গরম করি নে এসে কি সোহাগ, 'কৈ গো কংসদা দেও দেখি পা দু'খানা এট্টুস সেবা করি দিই'। শয়তানি। আস্ত শয়তানি। কৃষ্ণের তো মধ্যি মধ্যি সন্দেহ হয় 'লাট্টুর আসল বাপ কংস নয় তো।' পরক্ষণেই জীভ কাটে সে। ছি ছি এসপ কি ভাবছে সে। পাপ, পাপ ঢুকেছে তার মনে। কথায় তো বলে, 'জন্ম হোক যথা তথা কন্ম হোক ভালো'। লাট্টুকে বুকের মধ্যি তুলে নেয় কৃষ্ণ। সেই লাট্টুর পালক পিতা। লাট্টু তো তার 'সুর্দশন'। যে সুদর্শন দে ভগবান কৃষ্ণ কত পাপীর বিনাশ করিছে এ হল তার সেই 'সুদর্শন'। লাট্টুর কপালে চুমো দেয় কৃষ্ণ। দু' ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে লাট্টুর গালে। আর তখনই নজরে আসে আয়ান এই সক্কাল বেলাই চাড্ডি মদ গিলে বাওয়াল করছে উঠোনের ওপাশের নিম গাছতলায়। তাকে ঘিরে শুধু রাধু, সত্যভামা, রুক্মিণী, বিশাখা, ললিতা না, বড়ো জিরাকপুর গাঁয়ের মানুষদেরও বেশ জমজমাট ভীড়। বিনি পয়সায় তামাসা দেখছে সক্কলে। কৃষ্ণের মনে হয় সেখানে গে আয়ানের মুখি দুই লাথ কষায়। রাধুটা চীৎকার করি ওঠে, 'ও কেষ্টাদা বসি বসি খালি লাট্টুর মুতির কাঁথা বদলালে হবে? এসোগো এখানে। আয়ান আমাদের কি সুন্দর গান বেঁধিছে দেখো'। বলে নিজেই হেঁড়ে গলায় বেখাপ্পা সুর করি গাইতে থাকে, 'লাট্টু বাবু যায় / ইদিক উদিক চায় / কংস আর আয়ান ভেবি মরে / বাপ কেডা হয়'। কৃষ্ণ আর সহ্য করতি পারে না। লাট্টুকে ঝপাং করি দোলনায় ফেলি দাওয়ার পাশে পড়ে থাকা একডা ছোটোপানা বাঁশ ঘাড়ে করি নে ছুট্টে যায়। কৃষ্ণকে ঐ ভাবে তেড়ে খিঁচে আসতে দেখি ভীড়টা পাতলা হয়ি যায়। বিশাখা এসে বাঁশ চেপি ধরে। বলে, 'করছিস কি কেষ্টাদা? মাথা খারাপ হয়ি গেল নাকি? এক্ষুনি একডা খুন-খারাপি হয়ি গেলে সারা জেবন জেলের ঘানি টানতি হবে, নইলি ফাঁসীতে লটকাতি হবানে। ছেলে মানুষ করা তখন পোঁদে ঢুকি যাবানে।'

(২)

এ দলটার সুঙ্গি কৃষ্ণ তা নাই নাই করি পাঁচ বছর হল জুতে গেছে। না কোনো দুঃখ কষ্টে সে ঘর ছাড়েনি। স্রেফ মন বসতোনি। ইছামতী নদীর ওপারে সংগ্রামপুরের ঘাট পেরিয়ে শিবহাটি গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলটায় বাপের রাম ঠ্যাঙানির ভয়ে এইট কেলাস অব্দি ঘষটেছেও। কিন্তু যেই মাত্র নাইন ক্লাসে তাকে বসিরহাট পড়তে চালান করা হবে বলে বাড়িতে রব উঠলো তখনই কৃষ্ণের অন্তরাত্মা দমে বিদ্রোহ জানালো। না আর নয়। এক ভোর রাতে ক'টা জামাকাপড় আর ঠাকুমার লক্ষ্মীর ঘটখানা নে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমালো কৃষ্ণ। বাপ-মায়ের বুক ফাটা হাহাকার একটুও কানে বাজে নি তার। বরং অনেক বেশি করে বেজেছিল রেল গাড়ির বাঁশী। আহা সে যেন ছিল সত্যিকারের কৃষ্ণ ঠাকুরের মুরলী। ঘুরতে ঘুরতে সে কেমনি করি বীরভূমের লাভপুরে এসি পৌঁছেছিল, সে বেত্তান্ত নিতান্তই সাদামাটা। সেখানে এক বহুরূপীর দলের সঙ্গে ভিড়ে গে পথে পথে ভিক্ষে করি বেড়াতো। নীল রঙ মাখিয়ে, মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজি তাকে সত্য সত্যই কেষ্ট ঠাকুরের মতো দেখাতো। কিন্তু গাং-বিলের দেশের জলের পোকার মতো যে আজন্ম বড়ো হয়েছে, এপার ওপার দেখা যায় না যে নদীকে বুকে নে যে কিশোর হয়, তার কি কখনও ঐ রাঢ় দেশের টাড় অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতি ভালো লাগে? এক বছরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল মন। ইছামতী নদীটা শয়নে, জাগরনে তাকে ডাকতো। ঐ বহুরূপীর দলের মাথা লোকটার স্বভাব চরিত্তিরও ভালো ছিল না। ফাঁক পেলেই কৃষ্ণের গায়ে হাত বোলাতো। কেমন জানি ঘিনঘিনে লাগতো তার। একবার সাঁইথিয়ার বাজারে নটবর সেজি ভিক্ষে করবার সময় বিশাখা খপ করি তার হাত ধরি বলে, 'তুমি তো সত্যিকারের কেষ্টো ঠাকুর গো। ইদের সুঙ্গি কি মরতি আছো। আমাদের দলে যোগ দেবে চলো।'

ব্যাস, ঐ বাজার থেকেই ভোঁকাট্টা কৃষ্ণ। বিশাখা তাকে শেয়ালদহে নে এনে বসিরহাটগামী ট্রেনে চাপালে, কৃষ্ণ বলে ফেলে, 'ও বিশু তুই তো আমারে বাড়ি নে চললি'। বিশু হেসে বলে, 'আমাদের কংসদার কারাগারখানা যে উদিকেই। কিন্তু আমাদের দলের নেয়ম যে যা পার্ট করে তারে সে নামে ডাকতি হয়। আমরা সঙ সাজি তাই আমাদের আসল পরিচয় কাউরে জানানো মানা আছে কংসদার। আমারে তুমি বিশাখা বলেই ডেকো।' ট্রেনের জানলা দে ভরা বর্ষার গাভীন মেঘগুলো চাতকের মতো দেখতি দেখতি কৃষ্ণ বেলিয়াঘাটা, হাড়োয়া, মালতীপুর ইস্টীশানগুলো পার হতি লাগলো। রেল লাইনের দু'ধারে ধু

শুধু বিনবিন করি কেঁদে ছিল প্রণাম নেওয়ার সময়। বলেছিল, 'মাঝে মাঝে আসিস। কবে আছি কবে নেই'।

ইছামতীর ধারে বসি বসি সেসপ কথা বড়ো মনে পড়ে কৃষ্ণর। নদীর পারের তলতলে কাদামাটির ওপর তে' চোখো মাছগুলো মাঝেমাঝেই ভেসি উঠছে। ছোটছোট তেলি কাঁকড়াগুলো গুটিগুটি পায়ে দিকভোলার মতো হেঁটি চলিছে ইদিক-উদিক। এদিকে নাবালের জমিতে বড়ো বড়ো জলঘাসগুলো লকলক করছে। একটা বিষহীন জলঢোরা কাদার উপর দে সরসর করি নেমি জলে চলি গেল। কিছুক্ষণ জলের বুকে সাপ চলার আঁক দেখা যায়। কৃষ্ণেরও ইচ্ছা করে অমনিভাবে ইছামতীর জলে হারিয়ে যেতি। বড়ো জিরাকপুরের সরকারি জমিতে বলতি গেলি স্থায়ী আস্তানা গেঁড়ে নিয়েছে 'কংসের কারাগার'। কত দূরদূর মুলুক থেকি এ দলের কুশিলবেরা যে ইখানে এসে ভীড়েছে তা চমকে দেওয়ার মতো সে সপ কাহিনী। কৃষ্ণের বাড়িই ধরতি গেলি সব থেকি কাছে। প্রায় ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বেস ফেলে, তবু এই পাঁচ বছরে আর মন টানেনি সেখানে যেতি। তবে মেঘের গর্ভ ফেটি হলুদ রঙের কলকে ফুলের মতো আলো আলো রোদটা উঠলেই মার সেই হলুদ রঙের ছাপার শাড়িটার কথা মনি পড়ি যায়। বিশাখা একদিন চুপি চুপি বলেছিল, 'চ কেষ্টাদা তোর বাপের নোতুন বৌটাকে দেখি আসি।' কৃষ্ণ মুচকি হেসে উত্তর করে, 'বৌটাও যদি হলুদ ছাপা শাড়ি পড়ি থাকে। তার চে এই ভালো।' বিশাখা কৃষ্ণের কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতি না পেরি ভ্যাবলা মেরি তাকায়ে ছিল ড্যাবড্যাব করি। শুধু বিশাখা সখি কেন কংসের কারাগারের কেউই তার রকমসকম বোঝে না। তবে মানুষটা যে খাঁটী ভগবান কৃষ্ণের মতোই নির্ভেজাল তা এদ্দিনে সক্কলে বুঝে গেছে। পারতপক্ষে নেশাভাণ করে না। গ্রামের মেয়ে, বোউদের পেছনে মশার চাকের মতো পোঁ পোঁ করি বেড়ায় না। নিজের খেয়ালে থাকে। অভিনয়ের সময় ছাড়া রাধুটাকে তো কাছে ঘেঁষতি দেয় না। কংসও তাকে বিশ্বেস করে। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা ছেলেপিলের পেট নামলি বা ভয় খেলি কৃষ্ণের কাছে নে আনে। বলে, 'দেও দেখি বাবা মধুসূদন বাছার মাথায় হাত খানা ছুঁইয়ে'। সেই থেকিই বোধহয় কচি বাচ্চার গায়ের গন্ধ তাকে পাগলের মতো টানে। কলাটা, মূলোটা পাঁচ, দশ টাকা আয়ও হয় ভালো। তবে ওসব নে কৃষ্ণের মাথাব্যাথা নেই। সে আছে নিজেই নিজের রসে মজে। আর এখন তো লাট্টু তার দিন রাত গুলিয়ে দিয়েছে।

(৩)

বড়ো জিরাকপুর বিডিও অফিসের পাশে কুমীরের পিঠের মতো এই জায়গাখানা প্রেথম থেকি মনে ধরিছিল কংসের। দল নে সে যখন বর্ধমানের তালদি ছেড়ি ইখানে

আসে তখন ভরা শীত। বিডিও কর্তার মৌখিক আদেশে আর গাঁয়ের লোকেদের আশকারায় এই কুমীরের পিঠের উপর চরি বসে কংস। খর, বাঁশ, চ্যাচারি গাঁয়ের লোকেরাই জুটিয়ে দে ছিল। পলিথিন স্বয়ং বিডিও কর্তা। গড়ে ওঠে কংসের কারাগার। এই জমিটার ঠিক পেছনে একডা বড়ো পুকুর আছে। সিখান থেকেই রাঁধা, হাগা-মোতার জল আনে বিশাখা, ললিতারা। খাবার জল আনে বিডিও অফিসের টেপা কল থেকি। রাঁধু আনে। সত্যভামা সেই সাতসকালে একডা আস্ত খেঁজুরপাতা পুকুরে ফেলি রেখেছিল। বিকালবেলা সেটা হিড়হিড় করি টেনে এনি উঠোনে ফেললি দেখা যায় তাতি ফুল ফোঁটার মত গেঁড়ী-গুগলি জড়িয়ে আছে। তার মানে আজ রাতের মেনু গেঁড়ী-গুগলির ঝাল আর ভাত। গোল হয়ি সপ বসে পাতার গায়ে লেগে থাকা গেঁড়ী-গুগলি গুলো ছাড়াতি। লাট্টু ঘুমাচ্ছে বলে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে কৃষ্ণও এসি বসে। বিশাখাই তখন কানেকানে ফিসফিস করি খবরডা দেয়। প্রেত্থমটা শুনি বিশ্বাস করতি পারেনি কৃষ্ণ। বিশাখা বলে, 'তুমি কিস্যু করতি পারবা নাগো ওরগো সুঙ্গি'। কৃষ্ণ জানতি চায়, 'ওরগো মানী?' বিশাখা নিচু গলায় বলে, 'কংসদা আর আয়ান, লাট্টুকে ওরা দত্তক না কি বলে তাই দে টাকা নেবে। তিরিশ হাজার টাকায় রফা হয়েছে। যে লোকটা আর বৌটা নেবে তাদের কুনো বাচ্চা নেই তাই। বারাসাত থাকে। লোকটা নাকি সরকারি চাকরি করে।' কৃষ্ণ তবু জিজ্ঞেস করে, 'তুই কি করি জানলি?' বিশাখা বলে, 'আজ দুপুরি রাঁধু পা টিপতি গেছিল কংসদার কাছে। তখন সোহাগ খেতি খেতি হারামীটা বলি দেছে। আর রাঁধু কেমনি পেট পাতলা জানো তো।'

সেই থেকি লাট্টুরে কোলে নে বসি আছে কৃষ্ণ। না সে কোনো মতেই লাট্টুকে কারো কাছে বেঁচতি দেবে না। রাতে খেতেও আসেনি। স্বয়ং কংস তাকে খেতি ডাকতি আসলে ইছামতীর ভরা কোটালের জলের মতো ফুঁসি ওঠে সে—'লাট্টুরে তোমরা বেঁচবার তাল করছো?' কংস হাসি দে বলে, 'মসকরা করছিস কেন? চ' চ খাবি চ। খাওয়ার পর রেস্যালে বসবো। দোলের দিন শো আছে। এই উঠোনেই মঞ্চ হবানে। আগাম নে নেওয়া হই গ্যাছে।' কৃষ্ণ কংসের কথায় টাল খায় না, বরং আরও শক্ত হই গে বলে, 'লাট্টুকে তুমি বেঁচি দেচ্ছো কংসদা?' কংসও খোলোস ছাড়ে, 'ছেনালগিরি করিস না কৃষ্ণ। লাট্টুর বাপ লাট্টুরে দত্তক দেচ্ছে।' 'তালি তুমি টাকা নেচ্ছো কেনো?' গর্জে ওঠে কৃষ্ণ। ঠিক সে সময় ভুঁইফোড়ের মতো উদয় হয় আয়ান। 'আমরা দু'জনেই লাট্টুর বাপ, তাই টাকা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। তাতি তোর এত চুলকোচ্ছে কেন বাবা ত্রাহি মধুসূদন।' কৃষ্ণ প্রায় কোঁকিয়ে ওঠে বলে, 'আমি লাট্টুর বাপ। ও আমার সুদর্শন। একে একে ভীড় জমিয়েছে রাঁধু, বিশাখা, ললিতারা সক্কলে। রাঁধু বলে, 'এ তোমার ভারি অন্যায়'। দেখা যায় একমাত্র বিশাখা ছাড়া সক্কলেই কংস, আয়ানের পক্ষি।

রাত নিঝুম হলি, আকাশের গায়ে জরির ফুলের মতো তারাগুলো জেগি উঠলি কৃষ্ণ লাট্টুকে নে উঠোনে এসি বসে। আহা কি সোন্দর ঘুমাচ্ছে দেখো। ঠিক যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বিশাখা এসি পাশে বসে। পিঠে হাত রাখে কৃষ্ণের। এতক্ষণ বশে থাকা কান্নাটা আগল ছাড়া হয়ে ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ে। বিশাখা বলে, 'ছেলেমানষি করিস না কেষ্টাদা। যেখানি যাবে সেখানি লাট্টু রাজা হই থাকপে। তুই লাট্টুর মায়া ত্যাগ দে। ওরে ওর নোতুন বাপ, মার হাতে তুলি দে'। লাট্টুর শরীরের গন্ধ প্রাণ ভরে সারারাত ধরি নেয় কৃষ্ণ। বলে, 'বেশ আমি সুদর্শনকে ছেড়ে দেব। তবে এট্টা শর্ত, এই দোলে রাধাকৃষ্ণের লীলা না, হবে কৃষ্ণের যশোদা মায়ের হাতে তুলি দেওয়ার পালা। উই দিনিই লাট্টুরে আমি নিজি হাতে তুলি দেবো ওর নতুন বাপ-মায়ের হাতে'।

(৪)

নিমরাজি হলেও সক্কলে শেষ পর্যন্ত সায় দেছিল, বেশ 'মা যশোদার গৃহে যাত্রা' পালাই হবে। কৃষ্ণ বলে, 'ন্যাকড়ার পুতুল না স্বয়ং লাট্টুরে নে অভিনয় হবে। আর বসুদেবের পার্ট করব আমি'। আয়ানের গা জ্বললেও চুপচাপ মেনি নেয়। কৃষ্ণ উল্লাস করি বলে, 'কংসের কারগার থেকি আজ কৃষ্ণ নয় সুদর্শনের মুক্তি'। ঠিক হয় যারা লাট্টুরে দত্তক নেবে, তারা মঞ্চের বাঁ দিকি দাঁড়ায়ে থাকবে, কৃষ্ণ গে তাগো হাতে লাট্টুরে তুলি দেবে।

কৃষ্ণ আজ বসিরহাট বাজারে গে লাট্টুর জন্যি নতুন জামা, খেলনা কিনি আনিছে। আজ যেন তার আর ফুর্তি ধরে না। সারাদিন রঙের হুল্লোর করি গাঁয়ের লোকেরা রাধা-কৃষ্ণের লীলার বদলে 'মা যশোদার গৃহে যাত্রা'

দেখতি গে খেপেই উঠেছিল। কৃষ্ণই তাদের শান্ত করে। বসুদেবের চরিত্রে কৃষ্ণের প্রাণ কারা হাহাকার করা অভিনয় সক্কলের মন কেড়ি নেয়। স্টেজির উপর টাকার বৃষ্টি পড়ে। রাংতার মুকুটে লাট্টুকে সাতরাজার ধন এক মানিক লাগে। কৃষ্ণের অভিনয় দেখি লাট্টুরে দত্তক নীতি আসা বাপ-মাও চোখের জল মোছে। কথামতো কৃষ্ণ ওদের হাতে তুলি দেয় তার সুদর্শনরে। কৃষ্ণ দেখে বৌটা বুকে চেপি দু'হাত জড়ো করি নমো জানায় কৃষ্ণকে। আহা বৌটার কোলে কি সুন্দর লাগছে বাছাকে। ঠিক যেন মা যশোদার কোলে 'বাল গোপাল'। বোকার মতো কৃষ্ণও হাত জোড় করে। একসময় ভুস করি একডা চার চাকার আওয়াজ হলি পরে, বিশাখা এসি বলে, 'ঘরে চ' কেষ্টাদা। লাট্টুরে ওরা নে গেছে।'

লাট্টুর জন্মের পর এই প্রেথম মদ খেল কৃষ্ণ। লাট্টুর গায়ের দুধ-দুধ গন্ধটা ভুলতে। কড়কড়ে তিরিশ হাজার টাকা আর সাত জায়গায় পালার আমন্ত্রণে 'কংসের কারাগারে' আজ আমোদের বান ডেকেছে। নেশা করি এ ওর গায়ে লুটিয়ে আছে। অতগুলো মদ্দালোকের নাকডাকার শব্দে মনে হচ্ছে পৃথিবীখানাই বুঝি কেঁপি উঠবে। শুধু ঘুম নেই কৃষ্ণের দু'চোখে। সে লাট্টুর ছোটো ছোটো জামা, কাঁথাগুলো বুকির মধ্যি চেপি টলতি, টলতি 'কংসের কারাগার' থেকি বেড়িয়ে আসে। চাঁদটা আকাশে রুপোর থাল হয়ি ঝুলি আছে। কুমীরের পিঠের মতো জমিটা থেকি হামাগুড়ি দে পুকুরির দিকে নামতি থাকে। কি আশ্চর্যি! জলের মধ্যিও অবিকল আর এট্টা চাঁদ। খিলখিল করি নিজির মনি হাসে কৃষ্ণ, 'দুটো চাঁদ'। আচ্ছা চাঁদ যদি দুটো হয় লাট্টু তালি দুটো হতি পারে না কেন? আলবাৎ হবে। তাছাড়া কে কবে দেখেছে যে কৃষ্ণের হাতে সুদর্শন নেই। ঐ তো সুদর্শন। পুকুরের জলের মধ্যি চাঁদটার তলে। 'আসতিছি মানিক। বাপ আমার। এখনই আসতিছি। এট্টুস সবুর কর'। সরসর করি জলের মধ্যি নেমি যায় কৃষ্ণ। যত নামে তত সে লাট্টুরে দেখতি পায়। পা জল, কোমর জল, গলা জল, ডুব জল'।

আর দশটা সকালের মতোই সকাল হয়েছিল বড়ো জিরাকপুর গ্রামটায়। 'কংসের কারাগারের'ও এক এক করি ঘুম ভাঙছিল সকলের। দাঁত মেজি কুলুকুচি করি সত্যভামা, লতিতা পুকুর থেকি চলিও আসে। কিন্তু চোখ আটকে যায় বিশাখার। পুকুরের ওপার ঘেষি কি ভাসতেছে ওডা! মানুষপানা লাগতেছে না? গো গো করি ওঠে বিশাখা। আউ আউ করি ফিরি এসি 'কেষ্টাদা' বলি চিক্কুর মারে। না কৃষ্ণ কোথাও নেই। কেন থাকবে। এই ত্রিসংসারি কোথাও কি কংস এমন কারাগার বানাতি পেরিছে যেখানি কৃষ্ণরে ধরি রাখা যায়। গাঁয়ের লোক আজ এখানে ভেঙি পড়িছে। সক্কলের চোখে জল। কংস শুধু আয়ানরে পরামর্শ দেয়, 'মওকা বুঝি কেটি পর'। এট্টুস পর পুলিশ আসবানে। ভগবানের লাশ নে যাওয়া হবে কাটা ছেঁড়ার জন্যি'। তবে সকালবেলায় এই ধরাধামের কোথাও কি হরিতলায় জল দিতি গে কেউ সুর করি গাইছে না! ....

'শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল
ব্রজ বালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল
.....।'

ভারতীয় ফ্রিদা কাহলো

অভিজিৎ শীল

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে নারী শিল্পীরা সংখ্যালঘু হলেও বিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে তাদের শিল্প বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ভারতীয় শিল্পকলাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন রাজা রবি বর্মা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল রাও, যামিনী রায়, নন্দলাল বোস প্রমুখ পুরুষ শিল্পীরা। তেমনই অমৃতা শের-গিল, অর্পিতা সিং, ভক্তি খর, ভারতী দয়াল এনাদের মত নারী শিল্পীরাও তাদের শিল্পকর্ম পৌঁছেছেন বিশ্বের দরবারে। শিল্পমেধা, শরীরী সৌন্দর্য এবং অকপট আত্মপ্রকাশে প্রাচ্যের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অমৃতা শেরগিলের পাশে বসার মতো দ্বিতীয় কোনো নাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নারী চিত্রশিল্পী ভারতীয় ফ্রিদা কাহলো'-খ্যাত অমৃতা শেরগিল মাত্র সাতাশ বছর বেঁচে ছিলেন। শিখ বাবা এবং হাঙ্গেরিয়ান মায়ের সন্তান অমৃতার জন্ম ১৯১৩ সালে বুদাপেস্টে। পিয়ানো, বেহালা, ছবি আঁকায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন বয়স দশ ছোঁয়ার আগেই। এছাড়াও ইতালি ও প্যারিসে জলরং, তেলরঙের বাইরে ফ্রেসকো এবং তামা-খোদাইয়ে হাত পাকান। অমৃতার শৈশবের প্রথম ভাগ কাটে হাঙ্গেরির ডুনাহারাস্তি গ্রামে। ১৯২১ সালে তাঁদের পরিবার শিমলা চলে আসে। এই সময় থেকেই তিন চিত্রকলার প্রতি কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। ১৯২৪ সালে অমৃতা তাঁর মায়ের সঙ্গে ইতালী গিয়ে রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান সান্তা আনুনসিয়েটাতে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন।

দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি টান আর ব্যক্তিগত জীবনে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা নানা বর্ণে ধরা দিয়েছে তাঁর ছবিতে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি "Young Girls" ছবির জন্য অ্যাকাডেমি পদক এবং ফ্রান্সের গ্র্যান্ড সেলনের সদস্য নির্বাচিত হন। অমৃতা শেরগিল ও তাঁর শিল্পের সাথে ভারত ও ভারতীয় শিল্পকলার সম্পর্ক ছিল গভীর। তাই তিনি বারে বারে ফিরেছেন ভারতে এবং তাঁর শিল্পকলায় ফুটে উঠেছে এদেশের সামাজিক জীবন। বিষয়, ছবির ভাব এবং প্রকাশের রীতির দিক থেকে এই রীতি একেবারেই ভারতীয়। তাঁর ঐ সময়ের ছবির বিষয় ভিক্ষুক ও দরিদ্র মানুষ এবং গ্রামবাসী। ১৯৩৭ সালে অমৃতা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন, যা তাঁর ছবিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাপন। তার থেকেই ছবির বিষয় এবং প্রকাশে তিনি নিয়ে আসেন সারল্য, যার অনুপ্রেরণার ফসল তাঁর বিখ্যাত ছবি 'Bride's

Toilet', 'Brahmacharis', 'South Indian Villagers Going to Market'। পরবর্তী সময়ে অজন্তা ও ইলোরা ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল শিল্পকলার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং এই গুহা-চিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি চিঠিতে বোনকে লেখেন— "I can only paint in India. Europe belongs to Picasso, Matisse, Braque .., India belongs only to me."

১৯৩৮ সালে তিনি হাঙ্গেরিতে ফিরে যান, এবং তাঁর মামাতো ভাই ভিক্টর এগান কে বিয়ে করে সেখানে এক বছর থাকার পর আবার দেশে ফিরে আসেন। উত্তরপ্রদেশের সারায়া নামক এক গ্রামে থাকাকালীন তাঁর শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ হয় "Village Scene", "In The Ladies", "Enclosure" ও "Siesta" প্রভৃতি চিত্রের মাধ্যমে। এই শিল্পকলাগুলির মাধ্যমে গ্রাম্য জীবনবৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে। "Siesta", "Enclosure" ও "In The Ladies" ছবিগুলি যেমন The Miniature School of Painting দ্বারা অনুপ্রাণিত তেমনি "Village Scene" ছবিটি Pahari School of Painting শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর চিত্রকলা প্রধানত গ্রাম্য সামাজিক ব্যবস্থা, রীতিনীতি ও নারী বিষয়ক।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অমৃতা ও ভিক্টর সেই সময়ের শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র লাহোরে (অবিভক্ত ভারত) যান। অমৃতা তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ছবি "Two Women"; মনে করা হয় ছবিটি তাঁর এবং তাঁর বান্ধবী মেরী লুইসের। ১৯৪১ সলে লাহোরে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীর উদ্বোধনের কিছু দিন আগে রহস্যজনক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কোমায় চলে যান। ওই বছরের ৬ই ডিসেম্বর মধ্যরাতে তিনি মারা যান এবং রেখে যান তাঁর অসামান্য কিছু সৃষ্টি।

এই মহান নারী শিল্পীর মৃত্যুকে শিল্পবোদ্ধারা অভিহিত করেছেন নানা উপমায়, তারমাঝে অন্যতম হল— The princes who died unknown। বোদ্ধাদের হিসেবে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক শিল্পী। তাঁর সম্পর্কে দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ বলেছে— She provided a role model for women artists of future generation. তাঁকে যেসব উপনামে অভিহিত করা হয় তার অন্যতম হল— India's Frida Kahlo। পৃথিবীকে চমকে দেওয়া যত ক্ষণজন্মা গুণী মানুষ জন্ম নিয়েছেন নিঃসন্দেহে অমৃতা তাঁদের মাঝে অনন্য একজন। মাত্র আঠাশ বছর বয়সের মাঝে এই শিল্পী পৃথিবীকে যা দিয়ে গেছেন তার জন্য তাবৎ পৃথিবী আর শিল্পমহল কৃতজ্ঞতাভরে তাঁকে স্মরণ করে যাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন তিনি প্রকাশ করে গেছেন স্বমহিমায়—আপন রঙে ও ঢঙে। তাই তাঁর সম্পর্কে রবি ঠাকুরের এই চরণগুলি বলাই যায়—

ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত
যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

ইভান বুনিনের 'দি ভিলেজ'

রাহুল দাশগুপ্ত

ইভান বুনিনের 'দি ভিলেজ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। ওই বছরই লেভ তলস্তয় মারা যান। আন্তন চেকভ মারা গেছেন ১৯০৪ সালে। ম্যাক্সিম গোর্কি এই উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং চেকভের যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে বুনিনকে চিহ্নিত করেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে বুনিন নিজে লিখেছেন, 'আমি গ্রামজীবন নিয়ে কাহিনি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা ছাড়াও আমি সাধারণভাবে রুশ জীবনের ছবিও দেখাতে চেয়েছিলাম।' রাশিয়াকে গভীরভাবে জানতেন বুনিন। এই উপন্যাসে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'গোটা রাশিয়াই আসলে একটা গ্রাম। সারা জীবন একথা মনে রেখো'। দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, চেকভ বা গোর্কির মতো মহৎ দার্শনিক লেখকেরাও সম্ভবত রুশ মাটির, জনজীবনের এত গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি। এদের বেশিরভাগ লেখাই নগরকেন্দ্রিক। বুনিন যেভাবে রাশিয়ার গ্রামকে তুলে এনেছেন, সেখানকার মানুষের বসবাসের স্থান, পোশাক, খাদ্য, অভ্যাস, আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন, তা ছিল রুশ সাহিত্যে এক অভিনব ব্যাপার। বুনিনের গদ্যে কবিতা আর সঙ্গীত মিলেমিশে যায়, এক বিধ্বস্ত, অশান্ত জীবনের ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বিষন্ন গীতিময়তায়। এই জন্যই গোর্কি বলেছিলেন, 'ফর মি, ইউ আর এ গ্রেট পোয়েট'।

১৯৩৩ সালে প্রথম রুশ লেখক হিসাবে নোবেল পুরস্কার পান বুনিন। ১৯৩৭ সালে স্তালিন জমানায় ইভান বুনিনকে 'ক্লাসিক রাশিয়ান রাইটার' বলে জনসমক্ষে উল্লেখ করার অপরাধে ভারলেম শালামভকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সতেরো বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। মুক্তি পাওয়ার পর শালামভ কিন্তু আলেকসান্দার সলঝেনিৎসিনের সঙ্গে 'গুলাগ আর্কিপেলাগো'র সহযোগী লেখক হতে রাজি হননি, কারণ, সলঝেনিৎসিনকে তিনি নিজের তুলনায় নিকৃষ্ট লেখক বলে মনে করতেন। সলঝেনিৎসিন অবশ্য শালামভের মহত্বকে স্বীকার করে অকুণ্ঠভাবে লিখেছিলেন, 'শালামভ'স এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য ক্যাম্পস ওয়াজ লংগার অ্যাণ্ড মোর বিটার দ্যান মাই ওন'। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, স্তালিন-যুগেও ইভান বুনিন কতটা প্রভাবশালী লেখক ছিলেন এবং যদিও তিনি বহুদিন আগেই দেশত্যাগ করেছিলেন তথাপি তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের কী প্রবল ভীতি ছিল! বুনিনের রচনা যে কতটা সত্যনিষ্ঠ ছিল, তা এই ভীতির পরিমাণ দেখেই বোঝা যায়!

'দি ভিলেজ' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে আছে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব। তিখন আর কুজমা নামে দুই বয়স্ক ভাইয়ের কাহিনি আছে এতে। দুই ভাই যেন দুই গোলার্ধ, আর এই দু'জনকে নিয়েই গোটা রাশিয়া। এদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন ভূমিদাস। ১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা লোপ পায়। তিখন দুরনোভকা নামে জমিদারির মালিক, কুজমা সেই জমিদারির ম্যানেজার। 'দুরনোভকা' কথাটির অর্থ 'খারাপ' বা 'অশুভ'। তিখন বাস্তববাদী, পরিশ্রমী, বস্তুবাদী, নিষ্ঠুর আর আগ্রাসী। কুজমা ভাবুক, স্বপ্নদ্রষ্টা, পড়ুয়া, শিক্ষিত, হৃদয়বান, সংবেদনশীল। তিখন সারাজীবন প্রেমহীনতায় ভোগে, দরকার হলে জোর করে

দখল করে নিতে চায়। কুজমা প্রেমকে নিভৃতে লালন করে, তাকে গভীরে অনুভব করে। দুরনোভকা কোনও সহজ জায়গা নয়, তা হিংসা, অশান্তি ও নিয়মহীনতায় পরিপূর্ণ। এখানে অজ্ঞানতা, ঘৃণা, দারিদ্র্য, নোংরা, নিষ্ঠুরতা, আলস্য নিত্য বিরাজমান। প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়কার রাশিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই আখ্যানে। একজন ভূমিদাসের দুই উত্তরপুরুষ, তাদের একজন নিজেই হয়ে উঠেছে সামন্তপ্রভু, অন্যজন মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী, নাগরিক বুদ্ধিজীবী, একজন অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, অন্যজন ভবিষ্যতের, আর এই দুইয়ের সহাবস্থানই গড়ে তুলছে রাশিয়ার তৎকালীন বর্তমানকে।

লেভ তলস্তয় 'আন্না ক্যারেনিনা' উপন্যাসে এবং আন্তন চেকভ 'দি চেরি অর্চার্ড' নাটকে যুগ সন্ধিক্ষণের ছবি এঁকেছেন। দেখিয়েছেন, সামন্তবাদী রাশিয়া কীভাবে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী, শিল্পোন্নত রাশিয়ায় বদলে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কী বদলে যাচ্ছে? সামন্তবাদী সমাজের আসল কাঠামোটি কী একইরকম থেকে যায়নি? যে পরিবর্তন হচ্ছে, তা শুধুমাত্র বাইরের প্রলেপ, নগরে এবং মুষ্টিমেয় নাগরিকের জীবনে? এই প্রশ্নই যেন এই উপন্যাসে তুলেছেন বুনিন। উপন্যাসের প্রথম পর্বে তিখনের চরিত্রটি ছোটো ছোটো তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। খুবই তীক্ষ্ণ তার স্বভাব। চারপাশের গরিব মানুষকে আস্ত নির্বোধ বলেই সে মনে করে। নিজের কোনও সন্তান নেই তিখনের। সারাজীবন ধরে প্রচুর সম্পত্তি জমিয়েছে সে। কিন্তু এসবই তার কাছে বোঝার মতো মনে হয়। স্ত্রী অসুস্থ, তাকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে সে ক্লান্ত। জীবনটাই তার কাছে অসাড়, অর্থহীন বলে মনে হয়।

দুরনোভকা জায়গাটিও বিষন্ন, ঠাণ্ডা, নোংরা আর অন্ধকার। একজন জীবিত মানুষের সমস্ত প্রাণশক্তি শুষে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রতি পাঁচ বছরে এখানে একবার করে দুর্ভিক্ষ হয়। তিখনের দোকানে নানা ধরনের মানুষ আসে। ভিখিরি, ভবঘুরে, ছোটো ব্যবসায়ী, ভাড়াটে মেয়ে, রাতের পাহারাদার, গাড়িচালক, ঠিকে মজুর, নামহীন সব মানুষ। এইসব অভাবী, নিপীড়িত মানুষের মধ্যে রয়েছে যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্য, তাদের মাটির প্রতি সৌন্দর্যবোধ, প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্নতা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা, বিনীত-অবদমিত স্বভাবকেই তুলে ধরেছেন বুনিন। তিনি যেমন তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেননি, তেমনই তাদের মহৎ করেও দেখাননি, কোনও আবেগ প্রকাশ করেননি তাদের নিয়ে, বরং গভীর ভালোবাসায় তাদের চারপাশের অন্ধকার, হিংসা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তাদের অপাপবিদ্ধতাকেই দেখিয়েছেন, চারপাশের দুনিয়ার চালাকি ও দুর্নীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বদ্ধ জীবনে তাদের বেঁচে থাকার নিষ্পাপতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এত অভাব, দারিদ্র্য, নিচতা ও ক্ষুদ্রতার মধ্যেও বুনিন কবিতা ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, এমনই তাঁর সৌন্দর্যবোধ, বিশেষ করে প্রকৃতি, পরিবেশ ও আবহাওয়ার বর্ণনায় তিনি যে কোমল, সূক্ষ্ম, পেলব স্পর্শ দিয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবেই মার্সেল প্রুস্তকে মনে করিয়ে দিতে পারে। মেলায় গিয়ে তিখনের চোখ দিয়ে যেন রাশিয়াকেই দেখিয়েছেন তিনি। তিখন গেছে অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালে, নোংরা, বিবর্ণ চার্চে আর সমাধিস্থানে। মৃত্যু ও ক্ষয়ের ছবি দেখে আঁতকে উঠেছে। সমাধির গায়ে লেখা শান্তি, প্রেম ও বিশ্রামের কথাগুলো তার কাছে অসত্য বলে মনে হয়েছে। এক বৃদ্ধ মহিলার কাছে রূপকথার গল্প শুনেছে। নারী তীর্থযাত্রী ও মাতাল জনতার মুখোমুখি হয়েছে। চাষীরা নগ্ন ও ক্ষুধার্ত। যাজক অর্থলোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত। চারপাশের দারিদ্র্য দেখে তিখনের মনে হয়েছে, একজন জবরদস্ত মালিকের প্রয়োজন যে সব ঠিক করে দেবে এবং এই দুনিয়ার সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হল, ব্যবসা। এভাবেই পুরনো যুগের সামন্ততান্ত্রিক ও নতুন যুগের পুঁজিবাদী প্রভাব মিলেমিশে গেছে তার মানসিকতায়।

বিপ্লবের খবরে প্রথমে খুশিই হয়েছিল তিখন। কিন্তু বিপ্লবীদের হাতে জমি খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনায় সে ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, কোথাও কোনও বোঝাপড়া নেই। সবাই বিপ্লব, বিপ্লব বলে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু আগের মতোই রয়ে গেছে, নিতান্ত সাদামাটা। মানুষের কথায় বা নীরবতায়, সবকিছুতেই বোঝাপড়ার অভাব! পাখির গান, মাটির প্রশান্তি, ফুলের গন্ধ সবকিছুই আগের মতোই আছে। তিখন বিপ্লবীদের জন্য অপেক্ষা করে, তারা এলে গর্জন করে, তার শূন্যে ছোড়া গুলি আপেল বাগানে গিয়ে পড়ে, গোটা উয়েজদ জেলায় বিপ্লব ছড়িয়ে যায়, চাষীরা বিভিন্ন জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেয়, বেশ কয়েকটি জমিদারী দখল করে, জমিদারেরা পালিয়ে

গিয়ে সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের আশায় শহরের হোটেলগুলিতে গিয়ে ভিড় করে। বিপ্লবের পর জমিদারদের অবস্থা হয় শোচনীয়। তাদের অনেকেই অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটায়, শেষ সম্বলটুকু বেচে দেয়, ভাঙা জানলা বা ফুটো ছাদ সারাইয়ের অর্থ পর্যন্ত জোটাতে পারে না। অন্যদিকে নতুন একটা শব্দ খুব শোনা যায়। প্রলেতারিয়েত। এদের খাবার জোটে না, এদিকে বই কিনতে ফতুর হয়ে যায়। আর কী সব বই! এ এমন এক দুনিয়া, যেখানে, পকেটে পয়সা থাকলে তবেই তুমি দুনিয়ার মাথায় চড়ে বসতে পারবে।

বিপ্লবের পর সব শান্ত হয়ে গেলে, তিখন আবার বাবা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার জমিদারীতে আশ্রিতা রোদকার স্ত্রী ইভদোকিয়াকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণও করে। কিন্তু বাবা হওয়ার স্বপ্ন তার কাছে অপূর্ণই থেকে যায়। এরপরই তিখন নিজের ভাই কুজমাকে শহর থেকে ডেকে আনে এবং নিজের জমিদারীর ম্যানেজারের ভার দেয়। হতদরিদ্র, রিক্ত, দুর্দশাগ্রস্ত ছবি সেই জমিদারীর। একজন সুস্থ স্ত্রী, উষ্ণ ঘর, হইচই করা সন্তান, এই সমস্ত কিছুর স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্ন হয়েই থেকে যায় তিখনের কাছে। নিজের স্ত্রী পর্যন্ত সারাজীবন তার কাছে অচেনাই থেকে যায়, সে কেমন মানুষ কোনওদিন তার খোঁজ নেয় না সে। এখন ঘন ঘন তার মনে আসে শুধু মৃত্যুচিন্তা। আর অতীতের টুকরো টুকরো ঝলমলে স্মৃতি। আত্মহত্যার কথাও মনে হয়। বার্ধক্য ও মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনা নেই তার কাছে। সবসময় আত্মকরুণায় ভরে থাকে মন। জীবন খুব দ্রুত কেটে যায়, মানুষ মানুষকে স্রেফ ওপর ওপর চেনে, আর সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি ভুলেও যায়। দশ বছরকে মনে হয় সামান্য কয়েকটা দিন। এই কী জীবন! শান্তি ও স্তব্ধতার মধ্যেও তাই বিষন্নতা ছাড়া আর কিছুই বোধ করে না তিখন।

কাহিনি এবার আবর্তিত হয় কুজমাকে ঘিরে। নিজের দেশ ও মানুষ নিয়ে কুজমার মধ্যেও কোনও মোহ নেই। সে তার ভাইকে স্পষ্ট জানায়, এ দেশের মানুষ বন্য ও বর্বর। তারা শুয়োরের মতো বেঁচে আছে, পচে যাচ্ছে এবং শুয়োরের মতোই বেঁচে থাকবে। এটাই তাদের বেঁচে থাকার রীতি। গোটা দেশের ইতিহাস শুধু খুন আর বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ। এখানে কেউ সারল্য দেখাতে গেলে ডাকাতি করার চেয়েও বেশি অপরাধ করবে। গোটা দুনিয়ায় এরকম দরিদ্র্য দেশ আর নেই। দরিদ্র্য মানুষের সঙ্গে এত ইতর ব্যবহারও দুনিয়ার আর কোনও দেশে করা হয় না। দারিদ্র্যকে এখানে সহ্যসীমার শেষ প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়। তোমার খাওয়ার মতো কিছু না থাকলে তুমি চিন্তা করবে কী করে? গোটা দেশ ভরে গেছে ভিখারি আর বেশ্যায়। এখানে মেয়েরা হাতে রুটি নিয়ে পুরুষের শরীরের নিচে শুয়ে পড়ে। এভাবে প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়কার রাশিয়ার বর্ণনা দেন বুনিন।

কুজমা সারাজীবন শুধু পড়ালেখাই করতে চেয়েছে। তিখনের কাছে জীবন অন্তঃসারশূন্য। কুজমার কাছে জীবন অতি সাধারণ। আর এই সাধারণত্বই তাকে পীড়া দেয় সবসময়। জীবনের এই সাধারণত্ব মানুষের বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়। এরকম পরিবেশে, দারিদ্র্যে আর অভাবে, মানুষ কুঁকড়ে থাকে সবসময়। কুজমাও কুঁকড়ে গেছে। জীবনের শিক্ষা সে পেয়েছিল বৃদ্ধ অ্যাকর্ডিয়ন বাদক বালাশকিনের কাছে। এই লোকটি ছিল খামখেয়ালি আর মুক্তচিন্তাকে প্রশ্রয় দিত। বালাশকিনই তাকে শিলার আর তুর্গেনেভের 'স্মোক' পড়তে দেয়। তাকে বোঝায় সে এমন এক দেশের বাসিন্দা, যেখানে পুশকিন আর লেরমন্তভ, জাতির চিরশ্রেষ্ঠ দুই কবিকে হত্যা করা হয়েছে। অসামান্য ভাবুক, জর্জ প্লেখানভ এবং লেনিনের গুরু, দিমিত্রি পিসারভ জলে ডুবে মারা গেছে। ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহের নেতা এবং রুশ কবি কনদ্রাতি রিলেয়েভকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, হাতে বায়রনের কবিতার বই নিয়ে তিনি বধ্যভূমিতে যান এবং আবেদন করেন, তাঁর দেশ খুবই অসুখী এবং গোটা বিদ্রোহের জন্য তিনি একাই দায়ী, তাঁকে একাই যেন শাস্তি দেওয়া হয়। দস্তয়েভস্কি ও গোগোল, মহত্তম দুই গদ্যকার, কী পরিণতি হয়েছে তাঁদের? প্রথমজনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়জনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে উন্মাদ হওয়ার দিকে। ইউক্রেনের জাতীয় কবি তারাস শেভচেঙ্কো আর জারকে যিনি 'ফাঁসুড়ে' বলেছিলেন, সেই বিদ্রোহী রুশ কবি আলেকজান্দার পলিঝায়েভের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। দুনিয়ায় এরকম দেশ কী আর একটাও আছে?

রুশ সাহিত্যের বিচিত্র চরিত্র নিয়ে কুজমার সঙ্গে বালাশকিনের কথাবার্তা হয়। দস্তয়েভস্কির 'কারামাজভ ব্রাদার্স'এর কারামাজভ, ইভান গনচারভের 'ওবলামভ', লেভ তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস'-এর প্লাতোন কারাতায়েভ, 'কসাক'-এর ইয়েরোশকা, লুকাশকা,

গোগোলের 'দি গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর'য়ের খেলেশতাকভ, 'ডেড সোলস'-এর নোজদ্রেভ এইরকম। শ্চেদ্রিনের স্যাটায়ার এবং তলস্তয়ের প্রবন্ধ পড়ে কুজমার সময় কাটে আর কেবলই মনে হতে থাকে, জীবনটা কোনও কাজেই এল না, স্রেফ পশুশ্রম করেই কেটে গেল। মৃত্যুর আগে বালাশকিন কুজমাকে পরামর্শ দিয়ে যায়, জীবনের প্রতিটি ঘন্টায় কিছু না কিছু শেখো, কিছু ভাবো, আর চারপাশের দুর্ভাগ্য আর দুর্দশার দিকে তাকিয়ে দেখো। কুজমাকে সর্বক্ষণ পড়াশুনো করতেই দেখা যেত, অভিশপ্ত রুশ জীবনের নানা টুকরো, কখনও জুড়ছে, আবার কখনও বাদ দিচ্ছে। তলস্তয়ের 'কনফেশন' পাঠ করে টানা এক বছর কুজমা ধুমপান, ভোদকা পান বা মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। গোগোলের কথা তার মনে পড়ে। কিন্তু জীবনের সাধারণত্ব ভেতরে ভেতরে তাকে তিতিবিরক্ত করে তুলতে থাকে।

ভাই তিখনের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভবঘুরে জীবনই কাটিয়েছে কুজমা। রাশিয়া ও তার মানুষকে দেখেছে খুব কাছ থেকে। পেটের দায়ে নানা রকম কাজ করতে হয়েছে তাকে। ট্রেনে যেতে যেতে শুনেছে বিপ্লব আর দুর্ভিক্ষের কথা। কুজমার এই ভবঘুরে জীবনের সূত্রে রাশিয়ার খুঁটিনাটি অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন বুনিন। দরিদ্র্য মানুষ এখানে শীতের হাত থেকে বাঁচতে গোবরের স্তূপে নিজের শরীর ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। পনেরো কোপেকের জন্য গরীব চাষী জমিদারের কাছে নিজের স্ত্রীকে বেচে দেয়, যদিও একাজ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। কুজমার মনে হয় শহর থেকে গ্রামে এসে রাতারাতি সে বুড়িয়ে গেছে, অসভ্য হয়ে উঠেছে, কয়েকটা দিনকে মনে হয় বহু বছরের সমান। শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব এতটাই। ক্ষুধা ও নানা জটিল চিন্তায় কাতর হয়ে ওঠে সে। শুধুমাত্র বই হয়ে ওঠে তার নিত্য সঙ্গী। রুটির অভাব ছাড়াও মোমবাতির অভাবে বই পড়াও ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে।

দুরনোভকায় আসার পর কিছুটা স্থিতি জোটে কুজমার। খুব কৌতুহলী হয়ে সে এখানকার মানুষদের লক্ষ্য করে। ডাইনি থেকে শুরু করে এমন সব মানুষ এখানে আছে, মনে হয় যারা ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতা থেকে উঠে এসেছে। এখানে অভাব আর দারিদ্র্য ভয়াবহ। ঘরে ঘরে উপযুক্ত আলো, জ্বালানি আর খাদ্যের অভাব। সঙ্গে আছে বৃষ্টি, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আর তুষারঝড়। তার সঙ্গে বসন্ত, জ্বর, কলেরা ইত্যাদি নানা রোগব্যাধি, চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ছাড়াই। নতুন শস্য তোলার পরও চাষীর ঘরে পর্যাপ্ত রুটি থাকে না। এখানে লোকে বিশ্বাস করে, জার আদ্যন্ত সোনা দিয়ে তৈরি। কিন্তু এই দারিদ্র্যেও কুজমার সংবেদনশীলতা অটুট থাকে। চারপাশের স্তব্ধতার ভেতর সে শুনতে পায় গাছ থেকে আপেল ঝরে পড়ছে।

দুরনোভকায় এসেই সেরি আর তার ছেলে দেনিসকার সঙ্গে আলাপ হয় কুজমার। সেরির ঘরটা মনে হয় যেন মৃত, শীতল আর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অন্ধকার কুজমাকে ভারাক্রান্ত করে। রোদকার মৃত্যুর পর ইভদোকিয়া পুরোপুরি কুজমার আশ্রয়ে আসে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটির নিরুত্তাপ আচরণ সবারই বিস্ময় উদ্রেক করে। ইতিমধ্যে আরও একবার তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়, কিছু বাইরের লোক আপেল বাগানে এই চেষ্টা করে। ইভদোকিয়াকে নিজের মেয়ের মতোই দেখে কুজমা। কিন্তু ইভদোকিয়া মনে মনে কুজমাকে ভালোবাসে। কুজমার উদার হৃদয়ের জন্য কাঙাল সে। রোদকা থেকে কুজমার ভাই তিখন, সারা জীবন তাকে সবাই ভোগ করে এসেছে, কেউ ভালোবাসা দেয়নি। একমাত্র কুজমার কাছ থেকেই জীবনে সে প্রথম ভালোবাসা পেয়েছে। প্রতিদানে কুজমাকেও সে ভালোবাসা দিতে চায়। কিন্তু কুজমা তার মন বুঝতে অক্ষম। মেয়েটিকে নিজের কন্যার মতোই মনে করে সে। আর এই কারণেই কুজমার প্রতি মনে মনে কঠিন হয়ে ওঠে ইভদোকিয়া।

ভাই কুজমার প্রতি ইভদোকিয়ার এই মনোভাব গোপন থাকে না তিখনের কাছে। ভাইকে দেখে মেয়েটি যেভাবে লজ্জা পায়, তাই তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। এই মেয়েটিকে একদিন সে ভোগ করেছে। কিন্তু বিনিময়ে সন্তান বা ভালোবাসা কোনওটাই পায়নি। মেয়েটির প্রতি বদলা নিতেই তিখন যেন তাকে দেনিসকার হাতে তুলে দেয়। বদলা, কারণ তিখন মনে মনে দেনিসকাকে ঘৃণা করে। অথচ সেই ঘৃণ্য মানুষটির হাতেই বাকি জীবনের জন্য মেয়েটিকে তুলে দেয় সে। কুজমা এই বিয়ে ঠেকাবার অনেক চেষ্টা করে। ইভদোকিয়া ওপর ওপর কুজমার প্রতি কঠোর মনোভাব দেখায়। কুজমার জ্বরের সময় যখন সে মেয়েটির কাছ তেকে সহানুভূতি আশা করে, মেয়েটি তখন বিরূপতা দেখিয়ে সরে থাকে। তার এই ব্যবহার কুজমাকে

খুবই বিস্মিত করে। কুজমার প্রতি বদলা নিতেই মেয়েটি যেন বিয়েতে রাজি হয়, কারণ হিসাবে জানায়, ভিখারির মতো লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা চেয়ে বাকি জীবন সে কাটাতে পারবে না, নিজের নিরাপত্তার কারণেই সে এই বিয়েতে রাজি হয়েছে। কিন্তু বিয়ের সময় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। তাকে বিদায় দিতে গিয়ে কুজমা ভেঙে পড়ে, চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়। মেয়েটি ভয়ানকভাবে কাঁপতে থাকে। সে বুঝতে পারে, আবারও একটি পুরুষের ভোগের শিকার হতে চলেছে সে। জীবনে একমাত্র যে মানুষটি তাকে ভালোবেসেছিল, তার সঙ্গে চিরবিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন।

ইভদোকিয়ার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জমিদারীর ওপর থেকে সব টান চলে যায় তিখনের। বহুদিনের চেষ্টা ফসপ্রসূ হয়, দুরনোভকা বিক্রি হয়ে যায়। কুজমা ফিরে যায় শহরে, যে শহর তার কাছে আসল দুনিয়া, মানুষ খবর আর খবরের কাগজে ভর্তি। যদিও নতুন যে রাশিয়া আসছে তার প্রতি কোনই আস্থা নেই কুজমার। দেনিসকা যেন এই নতুন রাশিয়ারই প্রতীক। ব্র্যাণ্ড নিউ টাইপ। পুরনো রাশিয়ার চেয়ে অনেক বেশি চতুর ও কৌশলী। কুজমার মনে হয়, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, সব বোধই তার গুলিয়ে গেছে। কোনও কিছুই সে ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে না মানুষকে করুণা করা উচিত না ঘৃণা। মানুষের প্রতি কোনও আস্থা নেই তিখনেরও। সে তাই বলে, মানুষ হলো অলস, বাজে বকে, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী, কেউ কাউকে ভেতর থেকে বিশ্বাস করে না, সবাই ওরা একরকম। নিজেকে একটা চেনে বাঁধা শিকারী কুকুর মনে হয় তিখনের। সোনার খাঁচায় বন্দী। কারও প্রতি করুণা নেই তার। তাকেও সবাই ঘৃণা করে। জীবনটা আসলে একটা ছায়া, একটা স্বপ্ন। লোভ আর নির্বুদ্ধিতায় ভরা। জীবনে যা কিছু মুল্যবান মনে হয়, সবই আসলে বাজে ব্যাপার। অসার দম্ভই তাদের মুল্যবান করে তোলে।

এই উপন্যাস শেষ হয় প্রবল, প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে। মৃত্যু ও প্রেম, এই দু'টি বিষয় বারবার বুনিনের লেখায় ফিরে ফিরে আসে। প্রেমের কাহিনি রচনায় রুশ লেখকেরা গোটা বিশ্বে অতুলনীয়। বুনিনও কোনও ব্যতিক্রম নন। 'দি ভিলেজ'ও আসলে একটি অনবদ্য প্রেমের কাহিনি। দুই ভাই ও একটি মেয়ে। এক ভাই মেয়েটিকে ভোগ করে, অপর ভাই স্নেহ করে। যে ভোগ করে তার প্রতি মেয়েটি উদাসীন, যে স্নেহ করে তাকে ভালোবাসে। শেষপর্যন্ত মেয়েটির ভাগ্যের কোনও বদল হয় না। প্রবল দুর্যোগের মতো মেয়েটির ভাগ্যও বিপর্যস্ত হতে থাকে। দুই ভাইয়ের জীবনেও একাকিত্ব ছাড়া আর কিছুই জোটে না। সারা জীবন ক্ষমতা ভোগ করে, প্রবল দাপুটে তিখন শেষ পর্যন্ত আত্মিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়, হতাশা ও শূন্যতায় মৃত্যুচিন্তা তাকে গ্রাস করে, সন্তান ও সুখী পরিবারের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় সারা জীবন। ক্ষমতাহীন ও মেধাবী কুজমা ভোগে প্রেমহীনতায়, গভীর বিষাদে আক্রান্ত হয় সে, সম্পূর্ণ একা হয়ে আবার শহরে ফেরে সে।

এই দুই ভাইয়ের মধ্য দিয়ে রাশিয়া ও তার মানুষের গভীর দুর্দশার ছবি দেখিয়েছেন বুনিন। গ্রামের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার আত্মাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন তিনি এবং সেখানে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই টের পাননি। রাশিয়ার মহৎ স্রষ্টারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবিক সাহিত্য রচনা করেছেন। আবার সেই রাশিয়াতেই জারের আমল থেকে স্তালিনের আমল পর্যন্ত মানুষের ওপর ভয়াবহ দমন, পীড়ন, অত্যাচার চালানো হয়েছে। এটা ভাবলে অবাকই লাগে, যে রাশিয়ায় তুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, চেকভ, গোর্কি প্রমুখ মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার ও সহমর্মিতার শাশ্বত, মানবিক ছবি এঁকে গিয়েছেন, সেখানেই স্তালিন যুগে ১৯২৪-৫৩ সময়কালে শুধু রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা হয়েছে প্রায় ২ কোটি মানুষকে। একই দেশে এই ভয়াবহ বৈপরীত্য দেখলে অবাক হতে হয়। স্তালিন যুগে যে হিংসা সর্বগ্রাসী আকার নিয়েছিল, তার গোড়া প্রোথিত ছিল রাশিয়ার জনজীবনের মধ্যেই। অভাব, দারিদ্র্য, দুর্দশা, নৈরাশ্যে পীড়িত রাশিয়ার জনজীবনের সঙ্গে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। বুনিনের গ্রামই আসল রাশিয়া। সেই আসল রাশিয়াকে সত্যানিষ্ঠা ও বাস্তববোধের সাহায্যে এক মহৎ শিল্পীর নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। দস্তয়েভস্কি ও তলস্তয়ের মতো কোনও ইউটোপিয়াকে প্রশ্রয় দেননি, যেখানে জীবনের মহৎ, দার্শনিক সত্যগুলি উঠে এলেও রাশিয়া হয়ে উঠেছে এক সার্বজনীন পরিসর, ওই দেশের খাঁটি বাস্তবতা সেখানে তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গোড়া শুদ্ধ উঠে আসেনি, অন্তত যেভাবে উঠে এসেছে বুনিনের প্রকৃত পূর্বসূরি লেসকভ বা শ্চেদ্রিনের রচনায়।

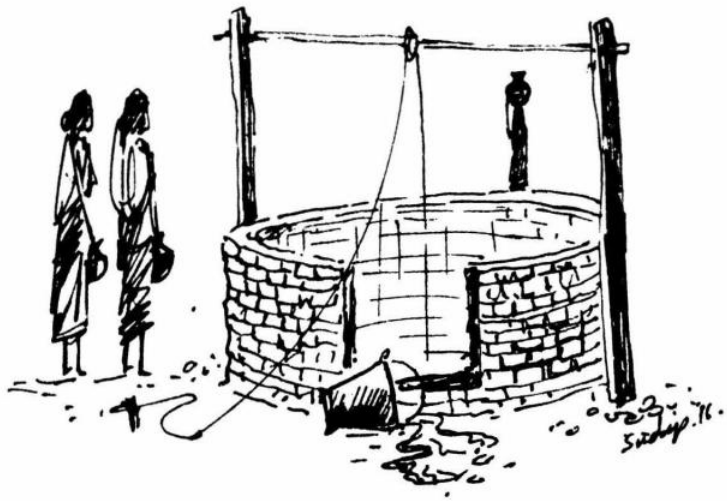

পানিবাই

তৃষ্ণা বসাক

ঘটকপুকুরে যেতে চাইলে দুটো স্টপেজে নামা যায়। এক, ডাক্তারখানা স্টপেজ। এক কামরার একটা মাটির চালা, সামনে ছোট্ট বারান্দা। একসময় রুগির ভিড় উপচে পড়ত সেই বারান্দায়, ভেতরঘরে নড়বড়ে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে থাকত প্রতাপ ডাক্তার। প্রতাপ কাঁড়ার হোমিওপ্যাথ। এক শিশি সুগার অব মিল্কে এক ফোঁটা ওষুধ ফেলে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াত, লোকে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি'। সেই ধন্বন্তরি প্রতাপ ডাক্তারকে হঠাৎ একদিন সকালে কেউ দেখতে পেল না। চেয়ার, টেবিল আছে, খোপ-খোপ ওষুধের বাক্স আছে, তক্তাপোশে তেলচিটে বিছানা, নীচে স্টোভ, কালি-লাগা হাঁড়িকুড়ি, দড়িতে ধুতি-গামছা, সব যেমনকার তেমন আছে। শুধু মানুষটা নেই। কেউ বলল, স্বপ্নে আদেশ পেয়ে হিমালয়ে চলে গেছে ডাক্তার, কেউ বলে বাড়ি থেকে খারাপ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছে। প্রতাপ ডাক্তার চলে যেতে সাত গাঁয়ের লোক কিছুদিন হা-হুতাশ করল, তারপর নতুন ডাক্তার খুঁজে নিল। কিন্তু ডাক্তারের ঘরটা তেমনই পড়ে রইল, থাকতে থাকতে জরাজীর্ণ হয়ে গেলেও ঠিক দাঁড়িয়ে রইল মাটির ওপর। আর বাস স্টপেজের নাম হয়ে গেল ডাক্তারখানা।

দ্বিতীয় স্টপেজের নাম ঘটকপুকুর স্ট্যান্ড। এখান থেকে রাস্তা একদিকে রায়দিঘি অন্যদিকে কাকদ্বীপের দিকে চলে গেছে। জায়গাটা সবসময়ই সরগরম। তিন-চারটে মিষ্টির দোকান, চপ-ফুলুরিও বেশ কয়েকটা, সারের দোকান, টেলারিং, ইদানীং একটা টিভি মেরামতের দোকানও খুলেছে পঞ্চায়েত প্রধানের ভাইপো নাড়ু। বিকেলে একটা রোল-চাওমিনের চলমান দোকানও বসে। তার গায়ে বড়ো বড়ো করে লেখা 'ঘটকপুকুর রোল কর্ণার'।

ঘটকপুকুর গ্রামে যেতে গেলে এই স্ট্যান্ড থেকে একটু পিছিয়ে আসতে হয়। ডাক্তারখানা স্টপেজে নেমে অবশ্য সোজা ঢুকে গেলেই হল। গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায়, পুকুরে হাঁসের সাঁতার দেখতে দেখতে গ্রামীণ ব্যাংকের পাশ দিয়ে সোজা ঘটকপুকুর হাটতলায় ঢুকে পড়া যাবে। এই হাটতলাটাই গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামটা তাকে ঘিরে পদ্মের পাপড়ির মতো ফুটে আছে।

ডাক্তারখানা আর স্ট্যান্ড—এই দুই স্টপেজের মাঝে গ্রামে ঢোকার আর একটা তৃতীয় রাস্তা আছে। বাস ওখানে দাঁড়ায় না। যদি দাঁড়ায়, তবে হয়তো স্টপেজটার নাম হতো, কাওরাপাড়া স্টপেজ। ঘটকপুকুরের কোনও মান্যগণ্য লোককে প্রকাশ্যে এ রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখা যায় না। আগেকার দিনে বাড়িতে যেমন মেথর ঢোকার আলাদা পথ থাকত, এই রাস্তাটাও তেমনি। ভদ্রসমাজের অস্পৃশ্য, অব্যবহৃত। আসলে এই পাড়ার বাসিন্দারাও তাই। পন্ডিতেরা বলেন এরা আগে ছিল জমিদারের পালকিবাহক, কাহার সম্প্রদায়। কাহার থেকে কাওরা। যারা পালকি না বইলে ভদ্রলোকের সভ্যতার গতিরুদ্ধ হয়ে যেত, অফিস-কাছারি, পালা-পার্বণে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত, এমনকী পালকি শুদ্ধু গঙ্গায় ডুবিয়ে পুণ্যের থলিটা বোঝাই করা যাদের দাক্ষিণ্যে,

তারা নাকি এত নীচু জাত যে গ্রামের ভেতরে তাদের বাস চলে না। তাদের রাস্তাটাও বিপদে না পড়লে কেউ ব্যবহার করে না। তো সেই কাওরাপাড়ায় লকলক করে লাউডগার মতো বেড়ে উঠছে ফুল্লরা কাওরা। তাকে নিয়েই এই গল্প।

২

ফুল্লরা একরাশ গোবর কুড়িয়ে ঘরে ফিরে দেখল তার মা সনকা দাওয়ায় বসে চুল খুলছে। সে প্রায়ই দড়ি দিয়ে চুল বাঁধতে গিয়ে গিঁট ফেলে দেয়, তাই দড়ির বদলে অনেকসময় শাড়ির পাড় ছিঁড়ে নেয়। আজ মার কাঁচাপাকা চুলে লালরঙের শাড়ির পাড় কেমন বেখাপ্পা লাগল ফুল্লরার। মার সিঁথির জায়গাটা ফটফটে ফাঁকা। তার বাপ দুখে মারা গেছে দু-মাসও হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, দুখেকে খুন করা হয়েছে।

দুখে কাওয়ার স্থানী কোনও পেশা ছিল না। মাঝে মাঝে সে নিত্য শাহর সিমেন্টের দোকানে মাল বওয়ার কাজ করত বটে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই তাকে কাজ করবার মতো সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যেত না। সে পড়ে থাকত পঞ্চার তাড়ির ঠেকে কিংবা মণিকা-কণিকার বাড়ি। সেখানে মদের আসর বসত, তবে সেটা মুখ্য নয়। দুখে খুব ভালো গান গাইত। তার গলায় গোষ্ঠগোপাল দাসের 'গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া' শুনে মহাপাতকের চোখেও জল আসত। তার গানের সঙ্গে নাল বাজাত সাগর। আর মণিকা-কণিকা, যাদের নামে গ্রামের সবাই বলে, তারা গ্রামের বুকেই, ভদ্রপাড়ায় লাইন খুলে বসেছে। তারা গানের মাঝে মাঝে মদ, চাট এবং হাসি পরিবেশন করত আর পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে তাদের আঁচল বার-বার খসে পড়ত।

এরকম অবস্থায় তাবড়-তাবড় ঋষিদেরই ধ্যানভঙ্গ হয়, দুখে তো কোন ছার! সে শুধু মনস্থির করতে পারছিল না, মণিকা না কণিকা—কে তার মন বেশি টেনেছে। নিজের এই সংশয়ে সে এতই নিবিষ্ট ছিল যে খেয়ালই করেনি, যে তার বাজনদার সাগর, তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেছে। এ বাড়িতে সাগরের যাতায়াত দুখের অনেক আগে থেকে, দুটি বোনকেই সে তার হাতের বাজনার মতোই ভালো বাজাতে পারে। তারাই যখন, দুখের গানে মজে, নতুন হাতে বাজতে চাইল, সে মেনে নিল না।

দুখে আর সাগর মাঝে মাঝেই দূর দূর গ্রামে মাচা প্রোগ্রাম করতে যেত। সেবার তারা গেল কাঁটাগাছি, কাঁটাগাছি ব্যবসায়ী সমিতির ডাক পেয়ে। ফেরার সময় সাগর একাই ফিরল, দুখে নাকি ওখান থেকে কোথায় চলে গেছে, কাউকে কিছু না বলে। কয়েকদিন পর দুখের বডি ভেসে উঠল খালের জলে। সনকা থানায় রিপোর্ট লেখাতে গিয়ে ফিরে এল। একে তো সাগর উঁচুজাত, তার ওপর সে পঞ্চায়েত প্রধানের লতায়পাতায় আত্মীয় হয়। সনকা চোখের জল মুছে বাড়ি ফিরে এল।

সনকার ফটফটে সাদা সিঁথিটা দেখে ফুল্লরার মনে আবার সেই ভয়ংকর দিনগুলো ফিরে আসে। সেই জল থেকে তোলা ফুলে ঢোল বডি, বাবা বলে চেনাই যায় না। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু ফুল্লরা জানে তার বাবাকে ছুরি মেরে খুন করেছে সাগর। পুলিশের মুখ বন্ধ করলেও লোকের মুখ অত সহজে বন্ধ করা যায় না। ইস্কুলের টিউকলে জল নিতে গিয়ে শুনে এসেছে সে, গাঁয়ের বউ-ঝিরা সেখানে খাবার জল নিতে ভিড় করে সকালে-বিকালে।

যত আগে গিয়েই লাইন দিক, ফুল্লরা জানে যে, সে জল পাবে সবার পরে। ছোটোবেলা থেকেই এমন দেখে আসছে। তখন বুঝত না। জেদ করে ওদের লাইনে দাঁড়াতে গিয়েছিল একবার। ওরা ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। খোয়ার ওপর পড়ে কপাল একটুর জন্যে ফাটেনি, কিন্তু মাটির কলসি ভেঙে গিয়েছিল। ছোট্ট ফুল্লরার কপালে গাঁদা পাতার রস লাগাতে লাগাতে তার মা বুঝিয়েছিল উঁচুজাতের জলের লাইন আলাদা, ওদের ছোঁয়া লাগলে যে জল ওরা খেতে পারবে না। ফুল্লরা বুঝতে পারেনি, সরকারি কলের জল ওদের ছোঁয়ায় কী করে অশুদ্ধ হতে পারে। তখনও ইস্কুল ছাড়েনি। খিচুড়ি ইস্কুল। সেখানে খুব করে প্রার্থনা গাইতে হতো, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।' গাইতে গাইতে ওর বুকে কীরকম একটা কষ্ট হতো। ওর মনে হতো, এখানে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, সেই আগুন তো বইয়ের অক্ষরের মধ্যে লুকোনো আছে। সেই আগুন যে ছুঁয়েছে, সে-ই শুদ্ধ। তার আবার জল-অচল কী? ইস্কুলে বেশিদিন যেতে পারেনি ফুল্লরা, কিন্তু গানটা ভোলেনি।

সবার পরে জল নিতে এখন আর কষ্ট হয় না। ও জেনে গেছে এটাই নিয়ম। কাওরাপাড়ায় দুখে কাওরার ঘরে জন্মালে এরকমই হয়। সেই জন্মদাতা বাবাও যদি ওরকম

বেঘোরে চলে যায়। শ্যাওলা-জড়ানো, ফুলে ঢোল দুখের লাশ মনে পড়ে যায় বারবার ফুল্লরার।

সনকার চুল খোলা হয়ে গেছিল। সে কেমন চোখে ফুল্লরাকে দেখতে দেখতে বলল, 'ঘরে শ্যাম্পুর পাতা আছে, মাথা ঘষে চান কর। বিকেলে, তোর মামি গেলবার যে শাড়িটা দিয়েছিল, নীল করে, ওটা পরবি।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে গেল। মার ভালো শাড়ি বলতে ওই একটাই। কোনও দিন চাইলেও পরতে দেয় না। বলে ছিঁড়ে যাবে। হরিসভায় মোচ্ছবের সময় তাদের পাড়ার মেয়েরা কত সেজেগুজে যায়। সেসময় কতবার শাড়িটা পরতে চেয়েছে ফুল্লরা, মা দেয়নি। আজ কী হল তার! সে তবু কিছু জিজ্ঞেস করে না মাকে। বাবা চলে যাবার পর মা কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। দশবাড়ি খেটে খেটে সারাক্ষণ তেতেপুড়ে থাকে, কিছু জিজ্ঞেস করলেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

সে গোবরটা উঠোনে রেখে হাত ধুয়ে কোমরে বাঁধা ওড়নায় মুছে নিল। তারপর ঘরে এল। শ্যাম্পুর পাতাটা নেবে। নীচু ঘর, দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না। দেয়ালে একটা আয়না ঝোলানো আছে। তার ঘষা কাচে ফুল্লরা নিজেকে দেখার চেষ্টা করে।

৩

এ গাঁয়ের অনেক মেয়েরই সকাল সকাল বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের সরকারি বয়সে পৌঁছোনোর অনেক আগেই। শুধু গরিব ঘরে বা নীচু জাতের মধ্যে নয়, বড়ো বড়ো ঘরেও এটাই স্বাভাবিক। ভালো ছেলে পেয়ে গেলে সবাই হাঁকপাঁক করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। সে সামনে মাধ্যমিক থাকলেও। আর ফুল্লরা তো স্কুলেই যায় না। তারওপর বাবাও নেই। তাই তার এই বয়সে বিয়ে ঠিক হওয়ায় কেউ অবাক হল না। কিন্তু ছেলের বাড়ি কোথায় জেনে সবার চোখ কপালে উঠে গেল। কথায় বলে, 'কোনও কালে নেই ষষ্ঠীপুজো। একেবারে দশভুজো'। একেবারে বম্বে। বম্বে তো একেবারে কল্পলোক। সেখানে ক্যাটরিনা কইফ, সলমন খান, শাহরুখ খান রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ভোরে সমুদ্র ধরে হাঁটলে বিগ-বি-র সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। সেখানে শ্বশুরঘর করতে যাবে কাওরাপাড়ার ফুল্লরা কাওরা!

ফুল্লরার বন্ধুরা শুনে বলল, 'তোর নাকি শাহরুখ খানের সঙ্গে বিয়ে!'

যদিও ঠাট্টা, তবু ফুল্লরার বুক তিরতির করে কেঁপে উঠল। সত্যি তার বিয়ে, তাও আবার বম্বেতে! মাঠে গোবর কুড়োনো, সেফটিপিন দিয়ে ফ্রক আঁটা, সবার শেষে জল নেওয়া—এই ছেঁড়াফাটা, তালিমারা জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে তার? শাহরুখ খান না হোক, তার বরের নাকি মেলা জমি-জিরেত, এখনকার মতো ভাতের ভাবনা থাকবে না বিয়ের পর। কিন্তু তাদের গাঁয়ের লোকগুলো কি হিংসুটে, কেউ একবেলা ভাত দেবে না, কিন্তু কু গাইতে ওস্তাদ। তাদের কাওরা পাড়ার বউ-ঝি থেকে শুরু করে, যে-বাবুদের বাড়ি মা কাজ করে, তারাও বলছে, 'হুট করে কোথায় বিদেশ বিভুঁইয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললে, জানো তো, বিয়ের নাম করে মেয়ে পাচার চক্র চলছে রমরমিয়ে, মেয়েগুলোকে দিয়ে কী যে করাবে—'

তার ধলাদাদু তাকে পাচার করে দেবে! ভাবলেও হাসি পায়। বাবা মারা যাবার পর এই দাদুই তো তাদের টেনেছে সাধ্যমতো। ধলাদাদু, মার কীরকম কাকা হয়, বম্বের একটা ফ্ল্যাটে পাহারাদারের কাজ করে। সেই এনেছে সম্বন্ধটা। ছেলের বাড়ি বম্বে শহর থেকে একটু দূরে। বিট্টলপুরা বলে একটা গাঁয়ে। ছেলের বয়স নাকি একটু বেশি। ছেলের এক মেসো কলকাতায় থাকে, সেই এসে দেখে গেছে ফুল্লরাকে। মা যেদিন তাকে নীল শাড়ি পরে সেজেগুজে থাকতে বলেছিল, সেইদিনই। মেসোর নাম ভগবান দাস। পাকানো গোঁফে মোচড় দিতে দিতে সেই ভগবান দাস ফুল্লরাকে একটা প্রশ্নই করেছিল—

'পিনে কা পানি আনতে কতদূর যেতে হয় বেটি?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিল, কিন্তু ঠিকঠাক উত্তরই দিয়েছিল। খুশি হয়েছিল ভগবান দাস। কে জানে, এক ঘন্টা দু-ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর কথা তাকে এত মুগ্ধ করেছিল কেন। হয়তো সে পরখ করে দেখতে চাইছিল ফুল্লরার ধৈর্য, সহ্যক্ষমতা. তারপর ফুল্লরাকে সুপুরি, রুপোর টাকা ও জরিন শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেছিল ভগবান দাস।

কয়েকদিনের মধ্যেই নিত্য শাহর বাড়ি কাজ করতে করতে ফোনে শুভ খবর পেয়েছিল সনকা। ফুল্লরাকে ওদের পছন্দ হয়েছে। কিন্তু জমি-জিরেত ছেড়ে ছেলে বিয়ে করতে আসতে পারবে না। ফুল্লরাকেই যেতে হবে। তাকে নিয়ে যাবে ভগবান দাস।

এতদিন গাঁয়ের লোকের নানান কথাতেও সনকার মন টলেনি। কিন্তু এখন বিয়ে হবে শুনে সে কেমন কেঁপে

উঠল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, ভাষাও অন্য, মেয়েটাকে সে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সব সে জানে, আর কী-ই বা করার আছে তাঁর? কিন্তু সাতপাকটা অন্তত যদি তার সামনে হয়ে যেত, বুকটা আঁটা থাকত। এই ভগবান দাস, যাকে সে একদিন মাত্র দেখেছে, তার হাতে একটা উঠতি বয়সের মেয়েকে সঁপে দেবে? ফোনের মধ্যে তার আশঙ্কা টের পেয়েছিল ভগবান দাস, সে আশ্বস্ত করেছিল সনকাকে। 'আরে বেটি, ঘাবড়াও মৎ। তোর মেয়েকে আমি কোনও কোঠিতে বেচতে যাচ্ছি না। সোজা শাদির মন্ডপে নিয়ে গিয়ে তুলব। আর তোর চাচা তো আছেই ওখানে।'

নির্দিষ্ট দিনে ভগবান দাস তাকে নিতে এসেছিল। নিত্য শাহ-র বউয়ের দেওয়া একটা পুরোনো কাপড়ের ব্যাগে টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে ফুল্লরা আবিষ্কার করেছিল মা কখন যেন নীল শাড়িটা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এতদিন ঘোরের মধ্যে থেকে সে ভাবেইনি বিয়ে মানে মাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাওয়া। নীল শাড়িটা তার সেই ভুলে থাকা ব্যথাটা খুঁচিয়ে দিয়েছিল। বিছানায় উপুড় হয়ে কেঁদেছিল ফুল্লরা।

৪

নতুন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হয়। কিন্তু বিট্‌টলপুরায় এসে বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই ঘুম এসে গেল ফুল্লরার। কারণ দুদিনের ট্রেন জার্নিতে সে প্রায় ঘুমোয়নি বললেই চলে। মাকে ছেড়ে এতদূর চলে আসার কষ্ট একটা ফোড়ার মতো টাটিয়ে ছিল বুকের মধ্যে, তার ওপর অচেনা একটা লোকের সঙ্গে আসা, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল হিংস্র নেকড়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

স্টেশনে নেমে ধলাদাদুকে দেখে ওর মন অনেক হালকা হয়ে গেল। ধলাদাদু আজ যেতে পারছে না, তবে বিয়ের দিন অবশ্যই যাবে। তারপর দুবার বাস পাল্টে সন্ধে নাগাদ বিট্‌টলপুরায় এসে পৌঁছোল।

বাস থেকে নেমে সে দেখল পুরো গ্রামটা অন্ধকারে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। বাস থেকে নেমে কাঁচা সড়ক দিয়ে অল্প একটু হেঁটে ওর শ্বশুরবাড়ি। একটা লোক আলো নিয়ে এগোতে গেছিল। উঠোন ঘিরে ছড়ানো ছিটোনো ঘর। লণ্ঠনের আলোয় ও বুঝতে পারল না ভালো। ওরা ঢুকতেই একদল বাচ্চা ছুটে এল। ওদের চিৎকার থেকে একটাই শব্দ বুঝতে পারল ফুল্লরা।

'পানিবাই! পানিবাই!'

কাকে বলছে কথাটা? নতুন বউকে এরা পানিবাই বলে নাকি?

ওকে হাত-পা ধোবার জায়গা দেখিয়ে দিতে গেল এক মহিলা। খুব শক্ত, হাড়-হাড় চেহারা, রাগি মুখ। সে দাঁতে দাঁত চেপে যা বলল, তা থেকে মোদ্দা কথা বুঝে নিল ফুল্লরা। মহিলা ওকে বলছে, একটা শুখা দেশ, বাংলার মতো হরা-ভরা নয়, তাই পানি কম খরচ করতে হবে।

তাদের ঘটকপুকুরে তাকে খাবার জল পাবার জন্যে সবার পেছনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে তো অন্য কারণে। সেখানে জলের ছড়াছড়ি। বাড়ির পেছনে হাঁসপুকুরে তারা ঝাঁপাঝাঁপি করে চান করত। আর এখানে দু-এক ঘটিতে তো পুরো গা-ও ভিজবে না। রাতের খাবারে মোটা মোটা রুটি আর বিচ্ছিরি স্বাদের একটা সবজি খেতেও ওর তত কষ্ট হচ্ছিল না, যতটা জলের জন্য হচ্ছিল।

রাতে ওকে শুতে দেওয়া হল একটা বুড়ির সঙ্গে। তাদের দেশে বয়স হলে সাদা বা হালকা খোলের শাড়ি পরে, এ বুড়ি পরে আছে ক্যাটকেটে সবুজ রঙের শাড়ি। তবে মানুষটা এমনি খারাপ না। শুয়ে শুয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর বিড়বিড় করে কী সব বলছিল। একসময় বুড়ির হাত ওর কোমরে এসে থামল। কোমর টিপে টিপে বুড়ি যেন কী পরখ করার চেষ্টা করছে। হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে ফুল্লরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে নিজেও জানে না। মাঝরাতে হঠাৎ কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙল। বিছানা হাতড়ে দেখল বুড়িটা নেই। ঘরের বাইরে থেকে মেয়েগুলোর কান্না আর পুরুষের চিৎকার ভেসে আসছে। শুনতে শুনতে ফুল্লরা আবার ঘুমিয়ে গেল।

পরদিন ঘুম ভাঙল শক্ত এক হাতের ধাক্কায়। সেই রাগি রাগি বউটা ওকে ঠেলা দিচ্ছে।

'এত বেলা অবদি ঘুমোলে পানি মিলবে?'

কে যেন পাশ থেকে বলল, 'আহা, সে তো আজই নয়, আগে তো শাদি হোক।'

'আরে রাখো তোমার শাদি, আজ যদি ঝুঁটি ধরে না তুলি, তবে আদত পড়ে যাবে বিছানায় শুয়ে থাকার।'

আরেকটি বউ অমনি ঝনঝন করে হেসে উঠল, 'আহা কোন সুখে বিছানা আঁকড়ে থাকবে বলো, সে তো তুমিই দখল করে আছ!'

এই কথা শুনে রাগি বউটি দপদপ করে চলে গেল। অন্য বউগুলো, যারা ফুল্লরার বিছানার চারদিক ঘিরে ছিল, তারা বলল, 'জলদি জলদি উঠে পড়, আজ না তোর শাদি?'

তাদের গাঁয়ে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বলে একটা কথা আছে। কিন্তু ফুল্লরার বুক কেমন ধক্ করে উঠল শুনে। 'আজই শাদি! ধলাদাদু যে বলল তিনদিন পরে?'

'আহা, এই তিনদিন পানি আনার জন্য অন্য বাই রাখবে নাকি?'

আসা থেকেই 'পানি' শব্দটা কতবার শুনেছে ফুল্লরা। মাথায় এখন যেন সেই জল টলটল করে উঠল। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। বউগুলো চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'হায় হায়! এই দুবলি পাতলি লেড়কি কী করে পানিবাই হবে? ভগবানচাচা কেমন মেয়ে টুঁড়ে আনল!'

পাশ থেকে কে যেন বলল, 'আশেপাশের গাঁয়ে তো কেউ রাজি হল না। ভগবানচাচা তাই বলল, বাঙালি লেড়কিরা কথা শোনে, তার ওপর বাপও নেই।'

বিয়ের মন্ডপে বসেও ফুল্লরার মাথায় টলমলানি যাচ্ছিল না। পানিবাই! পানিবাই মানে কী! নতুন বউকে এদেশে পানিবাই বলে নাকি? ভগবানচাচাকে ও কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না। পেলে বলত মাকে ফোনে ধরে দিতে। মা এখন নিত্য শাহ-র বাড়ি ঘর মুছতে মুছতে জানতেও পারছে না তার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

নিজের চিন্তায় এতখানি ডুবে ছিল ফুল্লরা, যে সে বুঝতেও পারেনি বিবাহমন্ডপে কখন বর এসে হাজির হয়েছে। বাচ্চাদের 'দুলহা আ গয়া, দুলহা আ গয়া' চিৎকারে সে সচকিত হয়ে দেখল তার সামনে এক দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত বক্ষ মানুষ, এদেশের রীতি অনুযায়ী মুখ ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুল্লরার বুক দুরদুর করে উঠল, সমস্ত ভয়, সন্দেহ, অপমান, ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে এইবার। তার কল্পলোকের শাহরুখ খান এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে বরমাল্য হাতে। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'মুখ খোলো কিষণলাল।' দুলহা মুখের ওপর থেকে চাঁদমালার মতো ঢাকা সরিয়ে নিল। অমনি ফুল্লরার নাকে এসে লাগল একটা পচা গন্ধ। বাবাকে জল থেকে তোলার পর যেমন গন্ধ বেরোচ্ছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি তো এমন গন্ধ কোথাও নেই। চারদিকে ঘিরে থাকা বউ-মেয়েরা সুগন্ধি ফুল ছুঁড়ছিল, কিষণলাল কড়া সেন্ট মেখে আছে, তবে? আসলে বুড়ো মানুষদের শরীর থেকে একধরনের পচা গন্ধ বেরোয়, শিথিল চামড়া, নড়া দাঁতের গন্ধ, বহু বছর দুনিয়া দেখে ভেতরটা পচে যাবার গন্ধ। সামনে দুলহা সেজে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার বয়স সত্তরের কম নয়। লোকটা ভাবলেশহীন চোখে ফুল্লরাকে দেখছিল, আর ফুল্লরার ষোলো বছরের সবুজ লাউডগা শরীর গুলিয়ে উঠছিল। এই তার শাহরুখ খান! সে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরতে দেখল, সেই বুড়ি মহিলা তার চোখমুখে অল্প অল্প জলের ছিটে দিচ্ছে। জলের স্পর্শে আরাম হচ্ছিল ফুল্লরার। আবার মায়ের কথাও মনে পড়ছিল। সে ডুকরে কেঁদে উঠতেই বুড়ি তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, 'দুলহার বয়স আর রূপ দেখে ফালতু কষ্ট পাচ্ছিস। যেমন না-কা-ওয়াস্তে শাদি, তেমনি নাম-কা-ওয়াস্তে পতি। তোর আসলি মরদ তো ওইটা।' বলে কী যেন একটা আঙুল দিয়ে দেখায় বুড়িটা। আর আঙুল অনুসরণ করে ফুল্লরা দেখে ঘরের কোণে একটা পিতলের বিশাল কলশি। গড়নটা তাদের দেশের তুলনায় খানিকটা আলাদা, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক বেশি ভারী। এতে করে জল আনতে গেলে মোষের শক্তি দরকার। আচমকা তার মাথায় পরপর কিছু দৃশ্য-শব্দ খেলে যায়, গত রাতে বুড়ির তার কোমর পরখ করা, দুবলি-পাতলি বাঙালি, পানিবাই! সে-ই পানিবাই নয়তো?

কান্নায় তার শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। বুড়ি তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'পাগলি কাঁহিকা! এখনও বরের বয়স ভাবছিস বসে বসে। আরে, ও তোকে কোনওদিনই বিছানায় নেবে না। সে তো আছেই আশাবাই। ধরমপত্নী। তবে কি না, পুরুষের কাম, কখন কাকে দেখে জেগে ওঠে। কুছ সাল পহলে, এক বরসাতের রাতে, আশাবাই বাচ্চা বিয়োতে মাইকে গেছে, আমাকে ডাকল। তা কী করে না বলি বল, পানিবাই হলেও বউ তো বটে। শরীরের স্বাদ পেয়েছিল তো, তাই আমায় তাড়ায়নি। এখন তো আর পানি আনতে পারি না, তাও রেখে দিয়েছে। অথচ কত পানিবাই এল আর গেল।

কান্না থামিয়ে বিস্ময়ে হতবাক ফুল্লরা বুড়ির দিকে তাকায়। এই বুড়ি কিষণলালের বউ!

বুড়ি বলে চলে, 'আসলি বাত কী জানিস? এ হল শুখা দেশ। সহজে পানি মেলে না। পানি দু-তিন গাঁও ভেঙে আনতে যেতে হয়। সকালে গেলে ফিরতে ফিরতে বিকেল তিনটে-চারটে। তা ঘরের বউ যদি পানি আনতে যায়, তবে ঘরের কাম-কাজ কী করে চলবে, খানাপাকানো, বালবাচ্চাদের পালপোষ কে করবে? তাই পানিবাইদের দরকার। শাদি তো একটা হচ্ছে, তাই মাইনে দিতে হয় না, ডাল-রুটি তো মিলবে দুবেলা। তা, কিষণলালের খুব বদনাম, বউটাও রাগি, তাই এখানকার কেউ আর পানিবাই হয়ে আসতে চায় না। একজনকে তো পিটিয়েই ...' বুড়ি কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। ফুল্লরা হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সেই নৈঃশব্দ্য থেকে কিছু খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করে, জলের মতো। শুখা দেশে চোখের জলও যে শুকিয়ে যায়, কে জানত!

৫

দূরে দূরে ছোটো কয়েকটা টিলা। পশ্চিমের টিলার পেছন থেকে কমলা আলোর বলটাকে আস্তে আস্তে নেমে যেতে দেখল ফুল্লরা। সূর্য ডুবছে। আজ তার বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখানকার বউরা মাথায় কলশি নিয়ে চলতে পারে। সেটা তার এখনও অভ্যাস হয়নি। সে কলশি নেয় কাঁখে। প্রথম প্রথম এত ভারী কলশি বইতে পারত না, একবার তো জলভরা কলশি দরজার কাছে পর্যন্ত এনে ফেলে দিয়েছিল। সেজন্য আশাবাই খুব মেরেছিল তাকে। রাতে খেতেও দেয়নি। গায়ের ব্যথায় সে পরেরদিন উঠতে পারেনি, জল আনাও হয়নি। সেই থেকে আশাবাই তাকে মারে না, কিন্তু বোলি বড়ো তীক্ষ্ণ তার।

চাবুকের মতো সপাং করে গায়ে বেঁধে।

কিষণলাল বলে যে-লোকটা তার স্বামী, সে অবশ্য কিছু বলে না। উঠোনো পাতা চৌপাইতে বসে শুধু চোখ দিয়ে অনুসরণ করে তাকে। সে দৃষ্টি দেখলেই গা ছমছম করে ফুল্লরার। কারণ কিষণলাল তাকে যে দেখছে, সেটা আবার আশাবাই-এর নজর এড়ায় না। একসঙ্গে দুজোড়া চোখের ভার বহন করা কঠিন।

অন্যদিন ঠাঁ ঠাঁ দুপুর রোদে সে ফেরে। আজ রোদ পড়ে গেছে। অত কষ্ট হচ্ছে না তার। কিন্তু মাসিক শুরু হওয়ায় কোমরে সে আর কলশি রাখতে পারছে না। এবার থেকে এদেশের বউ-ঝিদের মতো মাথায় কলসি বওয়া অভ্যাস করতে হবে তাকে।

রোদ নেই। তবু কলশি নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা গাছের ছায়া খুঁজল ফুল্লরা। গাছ, গাছের ছায়া তাকে বাংলার কথা, নদীর কথা, মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সেই বিয়ের দিন মাকে একবার ফোন করেছিল ভগবান চাচাকে ধরে করে। তারপর কত দিন, কত মাস হয়ে গেল কোনও খোঁজ খবর নেই। কিষণলালের একটা মোবাইল আছে, সারাক্ষণ সে সেটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনও বরসাতের রাতে সে যদি ফুল্লরার শরীর চায়, তাহলে, কিষণলালের মোবাইল নাগালে পেয়েও, মাকে ফোন করা হবে না ফুল্লরার। মার তো ফোন নেই। মাকে ফোন করতে হবে দিনের বেলা, মা যখন কারও বাড়ি কাজ করে। জল আনতে আসা-যাওয়ার পথে কোনও বাজার পড়ে না, যে সেখানে একটা ফোনের বুথ খুঁজে ফোন করতে পারে। তার কাছে অবশ্য পয়সা নেই, পানিবাইরা তো পেটখোরাকি, হাতে পয়সা পায় না। কিন্তু তার নাকে এককুচি রুপোর নাকফুল আছে, বাবার শেষ স্মৃতি। ফোনের বুথ পেলে ওই ফুল দিয়ে সে মাকে ফোন করবে। মা যেন ধলাদাদুকে পাঠিয়ে তাকে এখান থেকে নিয়ে যায়।

খুঁজতে খুঁজতে ফুল্লরা দেখল দূরে একটা শিমুল গাছ। মাংসল লাল ফুলে ছেয়ে আছে। শিমুল ফুল ফুটেছে। তার মানে একটা বসন্তকাল! আর কদিন পরেই বৈশাখ মাস পড়বে, তাদের হরিসভায় মোচ্ছব হবে, তাদের পাড়ার মেয়েরা সেজেগুজে গিয়ে কত মজা করবে, শুধু সে-ই থাকবে না। সবাই জানবে যে শাহরুখ খানের ...

হঠাৎ শিমুলফুলের রং দেখে বুক ধক্ করে ওঠে ফুল্লরার। বসন্ত এসে গেছে! তার মানে একদিন বর্ষাও আসবে। আশাবাই-এর আবার গর্ভ হয়েছে, বুড়ি, যার নাম যশোমতী জানিয়েছে তাকে। বর্ষাকালেই হয়তো সে মাইকে যাবে। সেইসময়, অন্ধকার রাতে, কিষণলালের বুকে তৃষ্ণা জেগে ওঠে যদি? বাংলার শ্যামল-সবুজ জল-ছলছল শরীর পান করার সাধ জাগে তার? যশোমতী বলেছে তাতে অন্যায় কিছু নেই। কিষাণলাল তো তার শাদি করা মরদ, সে তার শরীর নিতেই পারে। কিন্তু আশাবাই-এর মতো ঘর বা বিছানা সে পাবে না কোনওদিন। কিন্তু কিষাণলালের ইচ্ছেয় সায় দিলে আখেরে তারই ভালো। যখন ফুল্লরা একদিন বুড়ি

হয়ে যাবে যশোমতীর মতো, আর পানি আনতে পারবে না দূর গাঁও থেকে, তখন কিষণলালের মনে জাগরুক থাকতে পারে তার শরীরের স্মৃতি, সে হয়তো তাড়াবে না ফুল্লরাকে। তা না হলে রাস্তায় রাস্তায় ভিখ মেগে বেড়াতে হবে তাকে।

ফুল্লরা কি তাহলে সারাজীবন জল বয়ে আনবে একটা সংসারের জন্য, যে-সংসারটা তার নয়। তার নিজের আনা জলে দু-ঢোঁকের বেশি অধিকার থাকবে না তার? জল আনতে আনতে যশোমতীর মতো বুড়ি হয়ে যাবে সে? তখন তাকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে, যদি না কোনও বরসাতের রাতে কিষাণলালের ইচ্ছেয় সে সাড়া দেয়?

ভাবতেই ভেতরটা কেঁপে ওঠে। শিমুল ফুলের টকটকে লাল রং যেন বিপদ সংকেতের মতো তার চোখের সামনে নাচতে থাকে। বসন্ত থেকে বর্ষা আর কতই বা দূর। তাকে পালাতে হবে। তাকে এখনি পালাতে হবে।

দৌড় শুরু করার আগে সে নিজের আনা জল, কলশি কাত করে আঁজলা ভরে আশ মিটিয়ে খেয়ে নেয়। তারপর ধাক্কা মেরে উলটে দেয় কলশিটা। জল মাটিতে গড়িয়ে যায়, শুখা মাটি তা শুষে নেয় মুহূর্তে।

৬

অনেকক্ষণ থেকে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছিলেন ইনস্পেকটর ঘোসলে। মেয়েটার সাজপোশাক মারাঠি গাঁয়ের বউয়ের মতো, কিন্তু ওর সবুজ পানপাতার মতো মুখ, নরম চাউনি বলে দিচ্ছে ও বাঙালি। কিছুক্ষণ আগে তিনি এক দল বাঙালি মেয়েকে উদ্ধার করেছেন মুম্বইয়ের এক কুখ্যাত কোঠি থেকে। এদের কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুজন প্রতিনিধি এসেছে কলকাতা থেকে। তিনি নীচুগলায় তাদের সঙ্গে কীসব বলেন ...

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা থামার পর টিভি ক্যামেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েগুলোর ওপর। সবাই ওড়না বা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ফেলল অমনি। শুধু একটা মেয়ে উদাসীন মুখে বসেছিল। সাংবাদিকদের হাজার প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু একটাই কথা বলল, 'পানিবাই'।

৭

আবার ইস্কুলের সামনের টিউকল থেকে জল নিতে এসেছে ফুল্লরা। আগে যেমন আসত। কিন্তু ঠিক আগের মতো যে আর সবকিছু নেই তা সে বুঝতে পারছে। আগের মতো জলের জন্য সবার পেছনে দাঁড়াতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আগে তাকে দেখে বউদের এরকম কানাকানি, গা-টেপাটেপি ছিল না। সেদিন হাওড়া স্টেশনের ছবি অনেকেই দেখেছে টিভিতে। ওকে মুম্বইয়ের কোঠি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এরকম একটা খবর রটে গেছে চারদিকে। তাতে নতুন করে কিছু ক্ষতি হয়নি, আগেও ওরা একটেরে কাওরাপাড়ায় আধপেটা খেয়ে থাকত, এখনও তাই। মায়ের কাজগুলোও যায়নি, বরঞ্চ তার মেয়ের মুখ টিভিতে দেখা গেছে বলে খানিকটা সমীহ তৈরি হয়েছে। তবে সবাই সনকাকে বলছে, 'আগেই তোমাকে বলেছিলাম, শুনলে না।'

তবে লাভ একটা হয়েছে, কলকাতা থেকে ভালো শাড়ি-জামা পরা, চশমা চোখে একদল মহিলা দামি গাড়ি চেপে এসেছিল শুধু ওর সঙ্গে কথা বলতে। তারা ওকে শহরের মহিলা স্বনির্ভর কেন্দ্রে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে। কাজ শেখার পাশাপাশি কিছু রোজগারও হবে।

সবার জল নেওয়া হয়ে গেছে ভেবে ফুল্লরা তাড়াতাড়ি তার প্লাস্টিকের বোতল কলের মুখে বসাতে গেল। ঘোষেদের মেজোবউয়ের যে আর একটা বোতল বাকি আছে সে দেখতে পায়নি। মেজোবউ অমনি খরখরে গলায় বলে ওঠে, 'আরে ছুঁড়ি, মর মর। তোকে ছুঁয়ে আবার অবেলায় চান করব নাকি? একে কাওরা-হাঁড়ি, তারওপর দিল্লি বোম্বে সৃষ্টি জজিয়ে এসেছিস!'

শুনে শুনে অভ্যস্ত, তবু খামোখা চোখে জল এল ফুল্লরার। কয়েক মাস আগেও তার আনা জলের জন্য হাঁ করে থাকত আশাবাই আর তার ছেলেমেয়েরা। কিষণলাল লোটা ভরে পানি খেয়ে তৃপ্তিতে বলত 'আঃ'। ফুল্লরা বাড়ির জন্য কান্নাকাটি করলে যশোমতী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, 'লোককে পানি পিলানা বড়ো পুণ্যের কাজ রে। পানিবাই কি যে সে হতে পারে?' কয়েক মাসের তফাতে, সেই একই জল, তার ছোঁয়ায় অশুদ্ধ হয়ে গেল!

রাঙামাটির যুগলপ্রসাদ

অর্ক চৌধুরী

যুগলপ্রসাদকে মনে আছে?

আরণ্যক উপন্যাসের সেই ভবঘুরে চরিত্র, যে মানুষটি পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, লছমীপুরের জঙ্গলে বুনো ফুলের চারা আর বনের লতা এনে লাগাত লবটুলিয়া বইহারের মাটিতে। যে নাম না-জানা ফুল, ফল, বুনো ঔষধির বীজ খুঁজে এনে রোপণ করত নাঢ়া বইহারের পাথুরে জমিতে। আশায় থাকত এক দিন সে সব গাছ, লতা, বনৌষধির সবুজ প্রাণ মাথা তুলবে মাটির উপরে। অযত্নে ও আপন খেয়ালে বেড়ে উঠবে। মহীরুহের পাতা-ফুল-বীজ ভাসবে বাতাসে। ছুঁতে চাইবে আকাশের নীলিমাকে। যুগলপ্রসাদ এ সব কাজ করত মানুষের চোখের আড়ালে। তাঁরই একান্ত আবেগতাড়িত মনের খোরাক। সবুজের ধ্বংস দেখলে তার দু-চোখে নামত জলধারা। নাঢ়া বইহারের আর সরস্বতীকুন্ডির মাটিতে সে ফুটিয়ে চলেছিল শত শত জংলি ফুল ...।

পড়েছি কাঁকরাঝোরার প্রেমে। সঙ্গী ক্যামেরার ঝোলা। পুঁজি বলতে হরি-মটর। পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতের কুয়াশা ঠেলে ঝাড়গ্রামে নেমে পথের খোঁজ করতেই পিলে-চমকানো হেঁচকি উঠল। মধ্যবিত্ত সাবধান। ও পথে বাস চলে না। গাড়ি ভাড়ার নামে গাড়ির মালিকেরা ট্যুরিস্টের পকেটে ক্ষুর চালায়, প্রকাশ্যেই। এখানে আসা ভ্রমণার্থীরা বাস্তবে বেসরকারি গাড়ি-চালকদের মুরগিবিশেষ।

ভাড়ার হাঁকডাক শুনে বড় দুঃখেও হাসি পায়। বিকল্প তখনকার হাড়-জিরজিরে লগবগে বাসে চেপে প্রবল ভিড়ে হাড়গোড় গুঁজে হাড়-হাভাতে ভ্রমণ। মাত্র ৪২ কিমি পথ পার হতে দুটি ঘন্টার নির্মম অগস্ত্যযাত্রা। বেলপাহাড়ি থেকে পাথরকুচির ট্রাকে ভুলাভেদা। তারপর আরণ্যক চড়াইপথ মাত্র ১৬ কিমি।

জমির আল ডিঙিয়ে রাঙামাটির চড়াই ভেঙে বনদপ্তরের অফিস ডাইনে রেখে ঢুকে পড়লাম শাল বনে। একলা চলতে হয়। দিনের আলো নিভতে দেরি আছে অনেক।

স্বপ্ন বড় মধুর। চোখ খুলতেই ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি। আমার নাক বরাবর ঝুলে আছে একটা প্রায় দানবীয় মুখ। মাথাভর্তি টাক। তার ওপরে কাত হয়ে হনুমান টুপি। ডান হাতে একটা ধারালো হাঁসুয়া। আমি ভুমিশয্যায় শুয়ে প্রবল আতঙ্কিত। পরক্ষণেই বোমারু বিমানের শব্দ ছাপিয়ে প্রাণখোলা এক হাসির দমক। আওয়াজে পাশের লাটা ঝোপ থেকে দিগন্তের দিকে উড়ে পালায় এক ঝাঁক মুনিয়া। এক জোড়া বুনো খরগোশ নির্জনে প্রেমালাপ করছিল, তারাও চমকে উঠে ছুট লাগাল কুরচি বনের গভীরে। হাসি বড় ছোঁয়াচে। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো আমারও দু-ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ছড়ায়।

হাঁসুয়া ব্যাগে ভরে ধপাস করে পাশে বসে পড়ে আগন্তুক। তখনও শব্দ ছড়িয়ে হা-হা হো-হো করে হাসছে। বলে—"মহাশয় কি লেখক নাকি? এ পথে তো লেখক আর পাগল ছাড়া কেউ হাঁটে না। তাই জিজ্ঞেস করছি। কী, ঠিক বলেছি তো?"

"ওই এক রকম আর কী। আসলে ..." আমার কথা কেড়ে নিয়ে ও বলে—

"আসলে এ-ই অনেক কিছু। ইয়া-ইয়া সব নাম। কাগজ-কলম, মেশিনগান দু-বেলা ঘরে ঝগড়াঝাঁটি। ঠা-ঠা-ঠা-ঠা ...। অন্য কোনো কাজ জুটল না? নেহাতই বেকার না হলে কেউ লেখক হয় নাকি? বুঝলে কিছু?"

"না, ঠিক বুঝলাম না।" বলি আমি।

"মগজের জন্য লেখা। লেখার জন্য পড়া। বই-খাতা, কাগজ-কলম। তারপরে ছাপাখানা, মলাট, বোর্ড-বাঁধাই, পেপারব্যাক, তুলি, কমার্শিয়াল আর্ট এজেন্সি, বইমেলা, খরিদ্দার, পাঠক ... কত্ত হ্যাপা। তায় বাপু ওই লেখক আর পাঠক হল নিপাট গর্দভ। বাকি সবাই মাঝপথে ব্যবসা করে। পুঁজি কামায়। প্রথম আর শেষ দু-জনই গর্দভ। যে লেখে, সে না-খেয়ে মরে। আর যে গাঁটের কড়ি খরচ করে বই কেনে, বুদ্ধিমান লোক তাকে পাগল বলে। চালাক মানুষ ও সবে নেই। তারা হয় আমলা, না-হয় প্রোমোটার কিম্বা ঠিকাদার। আজকের দিনে পঞ্চুর নেতা হওয়ায় অবশ্য লাভ বেশি। লিডার বটে। তোমরা হলে গিয়ে গবেট। সব লেখকই হল এক ধরণের উজবুকবিশেষ। আমি বলি না। আমার ছোট বউমা আমার ছোট ভাই, মানে তার পতিদেবতাকে রোজই এ সব বলে গাল দেয়। কী, বুঝলে কিছু?"

"এক বর্ণও না। এক মিলিমিটারও মগজে ঢোকেনি।"

"কিছুই বোঝ না হে তোমরা। অথচ হাজার হাজার মানুষকে বোঝাতে যাও। সব আহাম্মকের দল। তোমরা সবাই হলে গিয়ে থার্ড ক্লাস সিটিজেন।" —বলে আবার উদাত্ত হাসি।

"তা হলে ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন কারা হল দাদা?" বলি আমি।

"তা-ও জান না বাপু? এ দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিক হল ঠিকাদার, দালাল, প্রোমোটার আর ওই খদ্দরের দোকানিরা। এই নাও হে, বরং পাউরুটি খাও।"

রাগ হলেও প্রতিবাদ করার দুঃসাহস আমার নেই। ওই হেঁসোর একটি কোপেই আমার মুন্ডুটি ধড় থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে। বিরক্তি চেপে আমি একটু পরে প্রশ্ন করি—

"আমি না হয় উজবুক, কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো জানা হল না স্যার।"

"অ, বলিনি বুঝি। আমি অবশ্য তোমার মতো বুদ্ধিবিছুটি নয়। বেশি বকবক করি বলে আমার গৃহিণী আমাকে বিশ্ববখাটে বলে।"

"না-না তা হবেন কেন? তবে কীনা ..."

"আমি ললিত বেরা। আমলাদের লেজুড়। সরকারি চাকুরে। এই তামাম ফরেস্ট বিটের মালিক আমি। ডেপুটি রেন্‌জার। ভোলে বাবা পার করেগা।" নিজের রসিকতায় হাসছে নিজেই। চোখ পিটপিট করছে আর পরম তৃপ্তিতে শুকনো পাউরুটি চিবোচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। আমি ভাবি এই উদ্ভট অরণ্যরক্ষকের কাঁধে যদি তক্ষকের মতো ভর করতে পারি তা হলে এ যাত্রায় আমার পদযুগল কিছুটা বিশ্রাম পাবে। সে কথা বলার আগেই ললিত বলে ওঠে—

"নাও হে, উঠে পড়ো। বেলা পড়তে আর বেশি দেরি নেই। তুমি বেয়ারফুট লেখক আর আমি বেয়ারফুট ফরেস্টার।"

দু-রে-র দিগন্তরেখায় ছায়া নামছে। নিবিড় শাল-মহুলের ফাঁক দিয়ে দিনমণির রথচক্র দিগন্তরেখার অনেক ওপরে প্রায় অস্তাচলগামী। গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়েছি প্রায় দু-ঘন্টা।

ললিতদা আমারই মতো পদযাত্রী। ভরসা একটাই, এই মরা বেলায় অরণ্যপথে পথ হারাতে হবে না। বড় সহজ সরল মানুষ এরা। মেকি ভদ্রতার ধার ধারে না। যা বলার মুখের ওপর বলে দেয়। পথের বাঁকে ছড়িয়ে থাকা গাছ, লতা, ঘাস, বুনো ফুল ধরে ধরে বিবরণ দিয়ে চলেছে। আউড়ে যাচ্ছে তাদের চলতি নাম, বিজ্ঞানসম্মত নাম, ঔষধগুণ—যেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। ছড়িয়ে-থাকা পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে ওস্তাদ ভূবিজ্ঞানীর মতো তাদের নাম, ধাম, বংশগরিমা, কী কাজে লাগে তা বুঝিয়ে দিয়ে কাউকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে খাদে আবার কাউকে ভরছে নিজের ব্যাগে। এ যেন আপন খেয়ালে গড়া আর

ভাণ্ডার তামাশা! এই মানুষ বলে কীনা পড়াশুনা করা আহাম্মকি! পড়ুয়া আর লেখকেরা নির্বোধ! কেতাবি জ্ঞান তো বটেই বহু দশকের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নীরব অরণ্যসাধক এই ললিত। বরাতজোরে এদের সান্নিধ্য জোটে। হাঁটার গতি পাহাড়ে যেমন হয়। স্লো বাট স্টেডি। পায়ে পায়ে উড়ছে ঝাঁক বেঁধে ঘাসফড়িং, তাদের পিছনে পাখির ঝাঁক। কেউ খাদ্য, কেউ-বা খাদক। ললিতদা হাঁটছে চড়াই-উতরাই ভেঙে। শর্টকাট জার্নি। হাঁটছে, কিছুক্ষণ পরেই বসে পড়ে কিছু যেন কাজ করছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম ওর ব্যাগে আছে একটা খুদে শাবল আর হাতে দাওলি। ছোট ছোট কাগজের প্যাকেটে হরেক রকম গাছের বীজ। মাটি খুঁড়ে নিরাপদ স্থানে সেই সব বীজ ললিতদা বপন করে চলেছে অবিরাম।

বিভূতিভূষণের আরণ্যকের যুগলপ্রসাদ আমারই পাশে। মনের গহনে সন্দেহের কাঁটা—প্রেতাত্মা নয় তো? এ-ও কি সম্ভব? এই জেট যুগের ভয়ানক স্বার্থান্বেষী মানুষের মিছিলে সেই আদি আরণ্যক মানবের সান্নিধ্য। নিজের চর্মচক্ষুকে অবিশ্বাস করি কী ভাবে? বলি—

"কী বীজ পুঁতলে ললিতদা?"

"দেখে ফেললে হে লেখক! তোমাদের চোখ এড়ানোর উপায় নেই হে। খয়ের গাছ হে, যে বস্তু পানে খায় বাবুরা। আসলে কী জান বাপু এ সব কাজ আইনের চোখে অপরাধ।"

"অপরাধ হবে কেন? তুমি তো অন্যায় কিছু করছ না।"

"ন্যায় অন্যায় হুজুরেরা বোঝেন। আমরা সরকারি মজুর। চাকরি করি তাই চাকরবিশেষ হে। এখন যা করছি তাতে ওপরওলার অনুমতি নেই। জঙ্গল হল সরকারি সম্পত্তি, কেউ লুঠ করলে বা গাছ কেটে সাফ করে দিলে দোষের হয় না। কিন্তু স্কিমের বাইরে গাছ লাগানো বেআইনি। অফ দ্য রেকর্ড। লিখে দিও না যেন। অন্তত যত দিন চাকরিতে আছি তত দিন লিখো না হে! ওপরওলার গোঁসা হলে চার্জশিট খেতে হবে।"

"তা যখন জানই, তখন এ কাজ কর কেন? পরিশ্রমও আছে, খরচও আছে। আবার শাস্তির ভয় তো আছেই।"

"নেশা হে লেখক, নেশা। এই বনে খয়ের গাছ নেই। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে নাথুয়াতে প্রচুর আছে। বীজ এনেছি নাথুয়া থেকেই। এখানেও ছিল এক সময়ে প্রচুর খয়ের গাছ। পরিহাটির কিছু দূরে বিহারের পাহাড়ি জঙ্গলে খয়েরবনি নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু খয়ের গাছ আজও বেঁচে আছে।"

"তা এখানে যে এখনও খয়ের গাছ আছে, লাগালে এখনও খয়ের গাছের জঙ্গল গড়ে তোলা যায়, এ সব কথা জানিয়েছ ওপরমহলকে?"

"একশোখানা চিঠি লিখেছি। সাহেবের মত আছে, তাই তো বেআইনি জেনেও লাগাচ্ছি। উত্তরবঙ্গে যাওয়া-আসা, বীজসংগ্রহ—সব খরচই সাহেব দিয়েছেন পকেট থেকে। তবুও এ সব বেআইনি। কারণ ইউনিয়ান এ সব করতে দেবে না। নেতারা বলেছে কাজ বাড়ানো চলবে না। আচ্ছা তুমিই বলো তো হে লেখক, কাজ কি কখনও কমে? কাজ করে যাও, কাজ তো তোমার বেড়েই চলবে গো।"

"আসলে ওই নেতারা কাজকে ভয় পায়। তাই কাজে বাধা দেয় ওরা।"

"ডি-গ্রুপ ইউনিয়ন গো, নেতারা সব সাহেবদের পা ধরে চাকরি পেয়েছিল। এখন ওরাই সাহেবকে মারতে যায়। বলে কীনা ও সব সাহেবটাহেব ওরা বোঝে না, সব সাহেবেরই লাশ হজম করে দেবে। সে যাক বাপু, এই যে নদী দেখছ এর নাম হল কঙ্করঝোরা। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে নুড়ি, পাথর, কাঁকর ঝরে এই নদীতে। এই চারপাশের পাহাড়গুলির নাম দুলকি ঘুরপাহাড়ি। এর পিছনে আছে লাকাইসিনি। তার পূর্বদিকে পাবে ঝালিয়া আর ময়ূর পাহাড়। তাদের পুবে সেই ঘাটশিলার বুরুডি পাহাড়ের পিছনে আছে সাদা পাহাড়। নাম সিংবুরু, স্বয়ং মহাদেব পশুপতির নিবাস, ওখানে তাই শিকার করা মানা। কঙ্করঝোরা, ভৈরোবাঁকি, খরসোতি, শিলাই এ সব নদীর জন্ম এই হিল-রেন্‌জ থেকেই। যেমন তোমাদের ডুলুং নদী। জানো সে কথা? সেই ডুলুং জন্মেছে ডুলুং ডিহা মৌজা থেকে।"

"শুনেছি, বিডিও শান্তিদা বলেছিলেন। চেন শান্তিবাবুকে?"

"চিনব না? কত বড় মানুষ। কবি বঠে। আর সেই কারণেই তো সাহেব হতে পারেননি। নইলে কবে উনি জেলার বড়কর্তা হয়ে যেতেন।"

"কিন্তু তোমার ডুলুং ডিহার কথা কী যেন বলছিলে?"

"ডুলুং তো হালের নাম। এর আসল নাম হল দোলন। মৌজাটার নাম ছিল 'দোলন দিয়া'। সাহেব-আমলের সার্ভের সময়ে ওই রেভিনিউ দপ্তরের কোনো এক বড়বাবুর কলমের খোঁচায় দোলন দিয়া হয়ে গেল ডুলং ডিহা। আর নদীর নামটাও বদলে গেল—ডুলুং। সরকারি অফিসে ওই বড়বাবুরাই তো কর্তাঠাকুর গো। বড়বাবু নোট না দিলে ফাইল নড়ে না। তা আমার হেড-আপিসের বড়বাবু বললেন, এ সব বাজে প্রস্তাব। হবেক নাই।"

"বাজে প্রস্তাব আবার কী হল?"

"খয়ের গাছ গো। আমি খয়েরবনির কথা বলায় সাহেব বললেন লিখিত প্রস্তাব জমা দিতে। তা দিলাম লিখিত রিপোর্ট। দেখে বড়বাবু বললেন—ও সব ধান্দা ছাড়তে হবে। নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। তোমার ওই খয়ের এখানে হবে না। আমার রাগ হল। বললাম, কেন হবে না? নদীর চরে খয়ের গাছের জঙ্গল আমি নিজের চোখে দেখেছি উত্তর-বাংলায়। এখানেও নদী আছে, চর আছে, চরে বালু আছে। তবে এখানে খয়ের হবে না কেন? গেলাম শেষে সাহেবের ঘরে। বড়বাবু হাজির। সব শুনে সাহেব বলে দিলেন—তোমার হিসেবমতো সবই ঠিকঠাক আছে মেনে নিলাম। তবুও খয়ের এখানে হবে না। বড়বাবুর নোটশিট বলেছে খয়ের প্ল্যানটেশন হিয়ার অ্যাট ডুলুং ডিহা রেড সয়েল ইজ ইমপসিবল ডিউ টু ক্ল্যাইমেটিক ফ্যাক্টর। নেচার সব কিছুকে সব স্থানে সফল হতে দেয় না। এই যেমন তোমাদের বড়বাবু সব কাজে কখনওই 'হ্যাঁ' বলবেন না।

কিন্তু স্যার এখানে খয়ের গাছ আছে। আমি দেখেছি। সাহেব বলেন—নিশ্চয়ই দেখেছ। আমিও বিশ্বাস করছি। কিন্তু সে গাছ আছে বিহারে। আমরা প্ল্যানটেশন করছি পশ্চিমবঙ্গে। তাই আমি বলছি না, তোমার বড়বাবু বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে খয়ের গাছ হওয়ার নয়।

তো আমারও জেদ চাপল। দশ দিন ছুটি চাইলাম। সেই দরখাস্ত দেখে খুব ভোরে আমার কোয়ার্টারে হাজির ডিএফও সাহেব। বললেন—ছুটি নিয়ে উত্তরবঙ্গে খয়ের বীজ আনতে যাবে তো। এই টাকাটা নিয়ে যাও। খরচ তো আছে। 'না' কোরো না—করে দেখিয়ে দাও যে ফাইলে যা-ই লেখা থাকুক, খয়ের গাছ এখানেও হতে পারে। চেষ্টা করতে দোষ কী? বড়বাবুকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। যা করার নিজেই করবে।

এ-ই হল আমাদের ডিএফও সাহেব। আর আমি তাই এখানে খয়ের বীজ পুঁতছি। সত্যি-মিথ্যে বলবে ভবিষ্যৎ। এই যে তোমাদের কাঁকরাঝোরার জঙ্গল, এখানে প্রচুর হরতুকি গাছ আছে। গাঁয়ের মানুষ সেই বীজ কুড়িয়ে তিরিশ মাইল হেঁটে বিকোতে যায় ঘাটশিলা, বুরুডির হাটে। ওসব কথা আমার আপিসের রেকর্ডে লেখা হয় না। আমি এখন চলেছি হরতুকির চারা খুঁজতে। ময়ূরঝোরা, ঝাঁটিঝোরার জঙ্গলে সে চারা পেয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে লাগাব ঝাড়গাঁয়ের জঙ্গলে।"

কাজ করতে করতেই এ সব বলে চলেছিল ললিতদা। অনূঢ়া জঙ্গলের মাটিতে সে রোপণ করে চলেছে হরেক কিসিম বীজ। খয়ের, চন্দন, বহেড়া, জ্যাকারান্ডা, জারুল আরও কত রকমের বীজ। অত নাম মন রাখার সাধ্য আমার নেই। একটা শ্যাওলা-ধরা মাকড়া পাথরের নীচের ছায়া-ঘেরা মাটিতে শেষ বীজটি পুঁতে সযত্নে মাটি চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ললিতদা; তারপর হাত নেড়ে তাড়া লাগায়—"চলো হে, চলো এ বার। জোরে পা চালাও। আঁধার গাঢ় হলে আর পথের দিশা মিলবে না। তখন ঘুরতে হবে নিশির ডাকে।"

"নিশির ডাক কী বস্তু ললিতদা?"

"এখনও নিশির নাম শোননি হে? আত্মা গো আত্মা। এ বস্তু ভূত-প্রেত নয়। তোমাদের ওই বিজলিবাতির দেশে নিশি থাকে না। আর বিজলিবাতির বনে ওদের দেখা পাবে না কখনও। নিশি থাকে এই বনে, শাল বনের গহনে। আত্মা, বনপরিদের আত্মা। বড় অসহায় ওরা। গাছের আত্মা। বনের আত্মারাই বনপরি। জানো হে লেখক, এ দিকে বড় টাকার আকাল লেগেছে। সবারই দরকার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। সবাই বড়লোক হতে চায়। চাষাভুষো, গাঁয়ের কুলিকামিন, মাস্টার, ডাক্তার, দারোগাবাবু, সেপাই, চৌকিদার সবারই এখন কুনজর এই জঙ্গলে। গাছ বেচলেই

নগদ কামাই। এই তো সে দিন এক বিডিও সাহেব জঙ্গল কেটে ১৪৪টা শালগাছ বেচে দিলেন। ডিএফও সাহেব রেইড করে সে সব গাছ উদ্ধার করলেন। বন-বাদা সব সাফ হয়ে যাচ্ছে লেখক। এই নিশিপরির দল তাই রাত হলেই কাঁদে। চাঁদ উঠলেও কাঁদে আবার ঘন আঁধারেও ওরা কেঁদে বেড়ায়। গাছের পাতায় কান পাতো। শুনতে পাবে ওদের কান্না। বড় অসহায় যে ওরা ...।" চুপ করে যায় বেরাদা।

"আচ্ছা বেরাদা, তোমার বাড়ি কোথায়?" কথা ঘোরাই আমি।

"দূর বাপু। মানুষের কোনো ঘর আছে নাকি হে? আকাশের নীচে আর মাটির উপরে হল আমার ঘর। তবুও ঠিকা ঠাঁই এক ছিল আমার। সে বহু দূরে। ঝাড়গ্রাম থেকে ১৭ মাইল পুবে বাহিরগাঁয়ে। ছেলেবেলায় বাগাল ছিলাম। গরু-ছাগল চরাতাম। যার নাম ভাতুয়া বাগাল। চাইল্ড লেবার। বংশ-পরম্পরায় দাসখত। বাচ্চার বয়স ৫ বছর হলেই বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে বাবুদের বাড়িতে। বাবুদের জোত আছে তাই তাদের লেবার প্রয়োজন। বাচ্চাটা হয়ে গেল ভাতুয়া। পেটচুক্তি লেবার। দিনে দু'বার ভাত, আর বছরে ছোট একটা গামছা। কুড়ি বছর বয়স হলে সে ফিরে গিয়ে হবে দিনমজুর। বিয়ে করবে। ছানাপোনা হবে তারাও ওই পাঁচ বছর বয়সে হবে ভাতুয়া। তা আমিও ছিলাম বাগাল। তা এক-দিন নিজের গাঁ ছেড়ে শহরে পালিয়ে এসে ইস্কুলে ভর্তি হলাম। বাবুদের ছেলেরা সবাই গালাগাল দিত। ফুটবল খেলতাম। আমার খেলা দেখে ফরেস্টার সাহেবের মন ভিজল। আমি হয়ে গেলাম ফরেষ্ট-গার্ড। প্রথম চাকরি শিমুলপাল বিটে। সে সময়ে এখানে থাকত প্রচুর ভাল্লুক। ফাগুনে মহুল ফুল ঝরলে দল বেঁধে ভাল্লুক নামত সমতলে। রাত গভীর হলে শোনা যেত চিতাদের হাঁকডাক, যেন রাজার বাচ্চা। রূপোলি ঝিকমিকে তাদের গায়ের রঙ। তার ওপর কালো কালো ছোপ। সবুজাভ মার্বেল, মানে ওই দু-চোখ ওদের পান্না রঙের। দেখলে মনে হত দলমা পাহাড়ের বাদশা। এই পাহাড়তলির সর্বত্র ওরা দাপিয়ে বেড়াত। সে সব চিতাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। (বেলপাহাড়িতে গ্রামের মানুষ ১৯৮৬ সালে একটি চিতাকে খুন করেছিল। বিশাল সেই চিতাটি জঙ্গলের শুকনো পাতায় আগুনের ভয়ে ঢুকে পড়েছিল গ্রামে। গ্রামের মানুষ চোরা শিকারিদের মদতে তাকে পিটিয়ে মারে। পরে ঝাড়গ্রামের রেন্‌জার গড়াইবাবু পুলিশের সাহায্য নিয়ে মৃত চিতার দেহ উদ্ধার করে রেন্‌জ্‌ অফিসে আনেন। —লেখক)

"ব্রিটিশ আমলে আইন ছিল কড়া। কিন্তু সাহেবরাই আইন ভাঙতেন। রক্ষকই ভক্ষক। রাজা-বাদশার যুগ, তখন জমিদার, কুঠিয়াল, রাজা, সাহেব, লালবেলাট সবাই আসতেন টেলিস্কোপিক রাইফেল কাঁধে। চলত বেপরোয়া চিতা শিকার। মরত ভাল্লুক, হরিণ, সাপ, হায়না, নেকড়ে। বাবুদের ছিল আগ্রাসী খুনের নেশা। তাদের বেপরোয়া বন্দুকের নিশানায় উজাড় হয়ে গেছে বনরুই (প্যাঙ্গোলিন) এমনকী শজারু, হরিয়াল, ময়ূরের ঝাঁক। চিতা, হরিণ, পাইথন, বনরুইদের চামড়ার দাম প্রচুর। তা দিয়ে তৈরি হয় মেমসাহেবদের জুতো আর ভ্যানিটি ব্যাগ।

"এখন জমিদারি নেই ঠিকই। কিন্তু জমিদারতনয়রা সব বনে গেছেন ঠিকাদার। তাঁরাই এখানে রাজনীতির নেতা। তাঁদের ক্ষুধার আগ্রাসী মায়াজাল। শাল, পিয়াল, কেঁদ, বহেড়ার জঙ্গল সাফ করে ওরা পুঁজি বাড়াচ্ছে। দলমার জঙ্গল আগামী দিনে মরুভূমি হয়ে যাবে।"

নির্জন শাল বনে জোনাকির মেলা। ললিতদার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি ছড়ায়। বাতাস জঙ্গলে আবদ্ধ হয়ে গুমরে উঠে এমন সব শব্দ সৃষ্টি করছে যে হঠাৎ মনে হয় প্রেতের কান্না। তীব্র হচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। ললিতদা বলে চলেছে পুরনো দিনের কথা—

"তোমরা মাঝে মাঝেই লেখ ব্যারেন ল্যান্ড, উইডো সয়েল। অফিসাররাও লেখেন ও সব বিভিন্ন রিপোর্টে। আমার মতে ও সব হল নিপাট মিথ্যে কথা। মাটি কখনও বিধবা হয় না। তা যদি হত তবে কি সাগরগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এই বিশ্বচরাচরে মানুষের সৃষ্টি হত? ডারউইন সাহেবের বিবর্তনতত্ত্বটাই তো মিথ্যে হয়ে যেত হে বাপু। None of your negetive examples generate positive thesis. পরিশ্রম অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে না ঝরালে ফসল ফলে না। জঙ্গলও হল আবাদি মাটি। গাছেরাও যত্নে সাড়া দেয়। পরিশ্রম না করলে জঙ্গল বাঁচবে কেন?

"সেই সাহেবদের আমল থেকে ঘুরছি এই দলমার জঙ্গলে; এই জেলা থেকে ওই জেলায়, ওই পাহাড় থেকে

সেই পাহাড়ে। দেখলাম হরেক রকমের মানুষ। ১৯৭৮-এ পদোন্নতির ফলে চলে গেলাম উত্তরবাংলার চাপড়ামারি জঙ্গলে। বিপুলাকার অরণ্য, যদিও ঠিক শাল বন নয়। পায়ের নীচে নিটোল সবুজের কার্পেট। নেশা-লাগা সবুজের সমারোহ। এখান থেকে নিয়ে গেলাম গামার, কেন্দু, মহুল, কুরচি আর বহেড়ার বীজ। কেন্দু বিশেষ সাড়া দেয়নি। বাকি গাছগুলি এ বারে গিয়ে দেখলাম অনেক বড় হয়ে গেছে।

"১৯৮১-তে গেলাম নাথুয়ার জঙ্গলে। ঘন সবুজের ছাদ। এত সাজানো সুন্দর জঙ্গল আমি আগে কখনও দেখিনি। নীচে ডায়না নদী। তার চরে খয়েরের জঙ্গল। গ্রীষ্মের দুপুরে নদীর জল থেকে উঠে-আসা ঠান্ডা বাতাস শিস কেটে ছুটে বেড়ায় খয়ের গাছের ডালে ডালে। বর্ষাতে ডায়নার কী বিপুল গতর! তারপর গেলাম রাজাভাতখাওয়াতে ট্রেনিং নিতে। গরিব চাষির ঘরে জন্মেছিলাম বাবু, টাকার অভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে পারিনি। তো সে বার ফরেস্ট ট্রেনিং-শেষে মিশ্র সাহেব আমার গলায় পরিয়ে দিলেন সোনার মেডেল। ম্যাট্রিক পাশ না করার বেদনা কিছুটা হলেও লাঘব হল।

"আবার ফিরলাম নিজের মাটি এই ঝাড়গাঁ-র জঙ্গলে। মাকড়া পাথরে ঘেরা, রাঙামাটি আমার জন্মভূমি। মা-আমার দেশের মাটি। বিভুঁইয়ে যতই দুধে-ভাতে থাকি, 'মা'র জন্য বুক তো কাঁদেই। মাটির টান তো বাপু রক্তেই বাসা বেঁধে থাকে হে। দূরে থাকা যে বড় বেদনার!"

পথ শেষ হয়ে আসছিল। গাছগাছালির ফাঁকে আঁধার নেমেছে বহু ক্ষণ আগেই। এখন বনে জমাট আঁধার। কেঁদ, বহেড়ার আগায় রাশি রাশি কুয়াশা। তাদের পাতায় শিশিরের মুক্ত বিন্দু। হিমেল বাতাস ঘিরে ধরেছে আমাদের। আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ। গাছের ফাঁক-ফোকর বরাবর যেন আমাদের সমান্তরালে আলোর ঝরনা ঝরিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে। মায়াময় জংলা রাতের নির্জনতা। জোনাক রঙের মিষ্টি আলোমাখা কুয়াশায় স্নান করছিলাম লাকাইসিনির সঙ্গে আমরাও। বাতাসে হিমকুঁড়ির পরশ। মনে হয় শাল বনের নিবিড় আঁধারে নিশির ডাক শুনছে ললিতদা। শুনছে বনপরিদের কান্না। আসলে ললিতদারা আছে বলেই জঙ্গল টিকে আছে আজও।

পথ ক্রমশ সামনে এগিয়ে ঘন শাল বনে ঘেরা নুড়ি-বিছানো চড়াই ভেঙে ক্রমাগত বাঁক ঘুরেই হারিয়ে গেছে পাহাড়চূড়ার চ্যাটালো গামলার মতো উপত্যকার আলো-আঁধারিতে। প্রায় সমতল থাক-কাটা মাটি এখানে। মাঠ আর কুয়াশা একাকার। বহু দূরে আবার ঘন হয়ে পথের কিনারা বেয়ে মন্দ গতিতে নেমে গিয়ে মিশেছে নীচের সমতলের ঘাসজমিতে। শাল বনে মাঝরাতে রঙের রোশনাই থাকে না। শুধুই আলোছায়ার আলপনা। মাঝরাতে সবই সাদা-কালো। নীরব মন্দিরার ঢিমে তাল। মাতাল হিমেল বনের বাতাস ঢেউ তুলে এখন কুয়াশাকে সরাতে চাইছে। কোদালে-কাটা সাদা মেঘ জমছে আকাশে। তার নীচে সাদা আলোর ছেঁড়া ছেঁড়া সিল্যুয়েট। কুয়াশার চাদর ভেদ করে এখন যেখানে উঠে এসেছি সেই শাল বন আলুথালু। পায়ের নীচে অসংখ্য নুড়িপাথর।

হঠাৎ থমকে যায় ললিতদা। ইশারা করে আমাকেও দাঁড়াতে বলে। অজানা আতঙ্কের মুহূর্ত। একটা বরফগলা তীব্র স্রোত যেন নেমে যাচ্ছে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ক্রমশ কোমর, উরুদেশ পার হয়ে দু-পায়ের পাতায়। দু-পায়ের গোড়ালি যেন নেমে গিয়ে গেঁথে গেছে পাথুরে মাটির গভীরে। স্থাণুবৎ উদ্‌ভ্রান্ত আমার কেন্দ্রীয় মগজ। সামনের পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথ বেয়ে ধীর গতিতে নেমে আসছে একদল বুনো হাতি। নামছে সাবধানে, খুবই ধীর গতিতে, দুলকি চালে আমাদের বিপরীতে। নুড়িপথে শব্দ উঠছে মুট-মুট-মুট। উতরাই বেয়ে বাঁয়ে পাক খেয়ে নেমে গেল ওরা, বোধহয় দূরের ঝরনার দিকে। মৌনতা ভেঙে ললিতদা বলে—"চলো হে লেখক, আর ভয় নেই। আসলে কী জানো, আজই বিকেলে এই দলে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এক শিশু গণেশঠাকুর। বাচ্চা নিয়ে মা হাতি আর ধাই-মা আছে আশেপাশেই। বাকি দল গেল খাবার আর জলের খোঁজে।"

উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলি, "চলো তা হলে ছবি করে আনি। দারুণ অভিজ্ঞতা হবে।"

"তুমি তো ভীষণ অবিবেচক হে বাপু। লজ্জা-শরমের বালাই নেই। এক্ষুনি যেতে চাও! তোমার বাড়ির আঁতুড়ঘরে ঢুকতে দাও বাইরের মানুষকে?" ধমকে ওঠে ললিতদা।

সাদামাটা অথচ অকাট্য যুক্তিবোধ। আজন্মলালিত ওর আরণ্যক ব্যক্তিত্ব। হৃদয়গভীরে মমতা-মাখানো অনুভব। ক্যামেরা ব্যাগে চালান করে আবার হাঁটা শুরু করি।

ঘুম আসেনি। তাই বসে আছি বনবাংলোর বারান্দায়। মাঝরাতেও আমি একা নয়। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে মরসুমি ফুলের ঝোপে। বুনো গোলাপের সুবাস বাতাসে ভেসে শিশিরবিন্দুর মাথায় তরঙ্গ জাগিয়ে অদৃশ্য আলপনা এঁকে মিশে যাচ্ছে সীতাহার ফুলের মিঠেকড়া সুবাসের সঙ্গে। তারপর ওরা হাতে হাত ধরে পাশাপাশি ভেসে বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরের বন-পাহাড়-মাঠ পার হয়ে সমতলের কোথাও, কোনো অরণ্যবালার আঙিনায়। সামনে মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদবুড়ি। শিশিরে ভেজা বুড়ি চাঁদ যেন মেঘের ভেলায় চেপে শূন্য সাগরে সাঁতার কেটে উজানস্রোতের রেখা বরাবর তীব্র বেগে চলেছে অসীমের পানে। মনে হয় এই বুঝি সে আছড়ে পড়ে খানখান হয়ে যাবে কঙ্করঝোরার রুপোলি জলে। পৌষশেষের ধান কাটার ঋতু প্রায় শেষ হয়ে এল। সামনে পরব। মকর আর আখান পরবের প্রস্তুতি গ্রামে গ্রামে। নতুন ধান কোটার গন্ধও ভাসছে নীচের উপত্যকায়। শাল বনে সুর উঠেছে টুসু গানের। মাঝিগাঁয়ে রাতভর ডানঠা নাচ, আর মাদলের বোল। পরব আসছে।

ললিতদা অরণ্য দেখে আনমনে। অরণ্য ওর রক্তে নেশা ধরায়। যুগলপ্রসাদ আর ললিত বেরা; সময়ের ব্যবধান দু-যুগেরও বেশি। নাঢ়া বইহার, সরস্বতীকুন্ডি, কঙ্করঝোরা, লালজলা, বুরুডি, সিংবুরু, পাবরা পাহাড়, ঝালিয়ার বন-পাহাড়ে এ রকম কতই না অরণ্যপাগল মানুষ আছে কে তাদের খবর রাখে। বহু দূরে দোলন দিয়ার বনেও বয়ে যায় সরস্বতীকুন্ডির বুনো বাতাস। সেই বাতাস হয়তো আজও বয়ে আনে হংসলতা, হোয়াইট বিম, রেড ক্যামব্রিয়াম, নাগকেশর, পারুইচাঁপার মতো আরও কত নাম না-জানা ফুলের গন্ধ। মেঘ, সমুদ্র, মৌসুমি বাতাসের মতোই 'আরণ্যক' প্রবীণ হয় না কখনও। যুগলপ্রসাদ, ললিত বেরার মত খেয়ালি মানুষেরাও যুগের পর যুগ ধরে বেঁচে থাকবে সময়ের চতুর্থ মাত্রা বরাবর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরেই। সবার অলক্ষ্যে। আনমনে। ওদের নিজেদের অরণ্যজগতে। একান্তে। সভ্য জগতের দৃষ্টির আড়ালে।

ভোর হয়ে আসছিল। অন্ধকার পাতলা হতে হতে কখন যে সুদূর দিক্‌চক্রবালে রামধনু-রঙ ধরেছে খেয়াল করিনি। সাত রঙের সমান্তরাল তরঙ্গমালা মিলেমিশে কমলা রঙের আবির ছড়াচ্ছে পাহাড়চূড়ায়। এগিয়ে এসে সেই মুঠো মুঠো গেরুয়া আবির দোল খাচ্ছে কেঁদ-বহেড়ার ডগার কুশিতে। হাঁটছে ললিতদা, হারিয়ে যাচ্ছে শাল বনের ছায়ায় ছায়ায়। অবিরাম ওর পথচলা। পাহাড় থেকে পাহাড়তলির অরণ্যবলয়ের গভীরে। বনের পাকদণ্ডী বেয়ে সে নেমে যাচ্ছে নিভৃত গিরিকন্দরের নিভৃত নির্জনে। অনেক দূরে লাটা ঝোপের আবডালে নবজাতক দলমার দামাল শিশুর ঘুম ভাঙল এ বার। তীব্র শাঁখের শব্দে বৃংহণ ... স্বাগত জানাচ্ছে ভোরের আলোর আলপনাকে। নির্জনে ভোমরা উড়ল কাজলকালো ডানা মেলে, বুনো ফুলের মধু-র খোঁজে। হিমেল হাওয়া হিমকুঁড়ি দুলিয়ে দূরে চলে গেল গাছের আগায় কাঁপন জাগিয়ে। টুপটাপ শিশির ঝরছে মাটিতে। ...

দু-বছর বাদে আবার এলাম ঝাড়গ্রামের সবুজ-ঘেরা লালমাটির আলুথালু শাল বনে, বেড়াতে নয়, ঠিকে বসত গড়তে পেশার টানে। ছোট্ট শহর। শান্ত শাল বীথির ছায়ায় মোড়া জনপদ। রেল স্টেশনের অদূরে বাসস্ট্যান্ডেও বিশেষ কোলাহল নেই। পথপাশে 'পান্থসখা'। কবি অশোক মহান্তির আশ্রমবিশেষ। কে যেন দেওয়ালে পোস্টার মেরে গেছে—'ভয় পেয়ো না, কবিদের ঝগড়া করিবার স্থান।' এই শান্ত জনপদে লেখকদের জন্য অবারিতদ্বার পান্থসখা।

মধুবন পার হয়ে হাঁটছিলাম চায়ের খোঁজে। হঠাৎই শুরু হল পথিপার্শ্বে মরসুমি ফুলের মেলা। রাঙামাটির চাদরের ওপর ছড়ানো ফুলের বাগান। রঙের মেলার রামধনুজালিকা। হাঁটতে গেলে আজও এখানে এসে থমকে দাঁড়াতে হবেই। এ বারও সেই পৌষালি সকাল। গাছের পাতায় কুয়াশাবিন্দুর মালা। সদ্য-কিশোরী দুই কলেজবালাও থমকে দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার পাশে। লুব্ধ চোখে ওদের চোরা চাহনি আধফোটা বসরাই গোলাপকুঁড়ির দিকে। বাঁ দিকে হাসি ছড়াচ্ছে ফ্লক্স্, পিটুনিয়া, ডায়ান্থাস, ন্যাস্টারসিয়াম। সামনে ক্যালেনডুলা, সিল্‌ভিয়া, স্যুইট-পি। তাদের আলুলায়িত দলমন্ডলে ভাসছে শত শত রঙিন ফড়িং। জোড়ায় জোড়ায় উড়ছে হরেক রঙের প্রজাপতি। মোরাম-ঢালা প্রশস্ত পথের

দু-পাশে জোড়া শ্বেত চন্দনের ডালে বসে একজোড়া ঘুঘু একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছে। তেজপাতা গাছের ঘন ছায়ায় দু-জোড়া কাজলগৌরী। চোখ-জুড়ানো রঙের বাহার তাদের ডানায়।

হঠাৎই পিছন থেকে কে যেন এসে চোখ টিপে ধরে প্রশ্ন করে—"বলো তো লেখক, কে বঠি আমি?" সেই পুরনো কণ্ঠস্বর। আমি বলি "ললিত বেরা ... তামাম জঙ্গলের মালিক বঠে।"

"ঠিকেই বলিছ হে লেখক, টুকু ভুল হল তবু, মালিক না—মজুর।"

আদুল গা, ঘাসে-ভেজা তামাটে শরীর। লাল মাটি আর শিশিরে মাখামাখি. হাতে সেই হেঁসো আর খুরপি। সেই প্রাণখোলা হাসির এনার্জি। মনে হয় গাছের ডালে বসে থাকা ওই ঘুঘুজোড়াও হাসছে ললিতদার হাসি দেখে। আমি বলি—

"এ বার বেড়াতে নয়। এ বার এসেছি থাকব বলে।"

"এই তো মরদের মতো কথা হে। দারুণ সব লেখার বিষয়বস্তু আছে হেথা।"

"ঘাটশিলার রাস্তায় কাঁকরাঝোরা গিয়েছিলাম। তামাজুড়ি হয়ে পরশু ফিরেছি। তোমার খয়ের গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে। আরও কত গাছ দেখলাম নতুন নতুন। ফুল ফুটেছে রকমারি। শিয়ারবিঁধায় তোমার খোঁজ করতে বলল, তুমি বদলি হয়ে গেছ। আজ এখানে তোমাকে পেয়ে যাব ভাবিনি। আছ কেমন?"

"খুব ভাল আছি। আরে বাপু, আমি কোথাও খারাপ থাকি না হে। চলো খয়ের গাছ দেখাই।" বলেই টেনে নিয়ে গেল পশ্চিম কোণে। বলে—"কী দেখছ বলো তো হে, কী গাছ এই দু-জোড়া?"

আমি বলি—"আরে! খয়ের গাছ এখানেও লাগিয়েছ। আরে! এ দু-জোড়া চিকরাশি। দার্জিলিঙে পাহাড়ে দেখেছি।"

"এখানেও হয় হে। মাটি কখনও বন্ধ্যা হয় না। বিশ্বাস হল তো। এ বছর থেকে রাজ্য সড়কের দু-পাশে বনদপ্তর প্রচুর চিকরাশি পোঁতা শুরু করতে চলেছে।"

"কিন্তু তোমার বড়বাবু, সাহেবরা দেখেছেন এ সব?"

"ওইখানেই তো মজা রে দাদা। পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের ডিএফও সুলতান সাহেবকে খয়ের গাছ দেখিয়ে এনেছি।"

"মির্জা আসগর সুলতানের কথা বলছ কি? উত্তরবঙ্গে ছিলেন খুবই জেদি মানুষ। জাঁদরেল অফিসার। বিলক্ষণ চিনি ওঁকে। এ সব খয়ের, চিকরাশি দেখে কী বললেন তিনি?"

"আরে বাপু, শিক্ষিত মানুষ। জঙ্গলবিশেষজ্ঞ। বললেন—মি. ললিতবাবু, এখন তো আর তোমার খয়ের চারা বিহার সীমান্তের ও-পারে নেই। এ রাজ্যেও চলে এসেছে। এবার তুমি সর্বত্র খয়ের প্ল্যানটেশনের সরকারি নির্দেশ অবশ্যই পাবে। কিন্তু স্যার, বড়বাবুর নোটশিটের কী হবে? শুনে সাহেব বলেন—ডোন্ট বিহেভ লাইক আ পেপার টাইগার। গেট রেডি অ্যান্ড প্রিপেয়ার ইওরসেল্‌ফ। বিকজ ইওর জব উইল মেক ইউ অ্যালাইভ ইন ফিউচার। চারা তৈরি করতে শুরু করো। অফিস আমি সামলাচ্ছি।"

"কিন্তু তোমার সেই বড়বাবু তো আর ছেড়ে কথা বলার মানুষ নয়। বিশেষ করে লিডার যখন", আমি বলি। জবাবে ললিত বলে—"সাহেবের মুখে সব শুনে তো বড়বাবু আমার ওপর রেগে আগুন তেলে বেগুন। সাহেব ওঁকে বললেন দেখে আসতে। তা ওঁর সময় কোথায়? সম্মেলন, মিটিং, মিছিল, তহবিল-সংগ্রহ ... ৩৬৫ দিনে হাজার-তিরিশটিরও বেশি কাজ। আমাকে প্রকাশ্যেই ধমকে বললেন— ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছ, দ্যাখো কী হয়? তা দু-মাসের মাথায় আবার বদলির নোটশিট ঝাড়লেন উনি। সাহেব শেষ পর্যন্ত মাঝামাঝি রফা করে আমাকে এখানে বদলি করে আনলেন। আর আমি এখানে এসেই চার জোড়া খয়ের কাজ লাগিয়েছি।"

এখন মরসুমি ফুলের পাপড়ির আগায় চুমকি রঙের শিশিরবিন্দু সোনালি ঝিলিক। ললিতদার বাগানে সাতাশ রকমের গোলাপ। এই রাস্তায় স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের অবিরাম যাতায়াত। ফুলের টানে ওরাও ঢোকে বাগানে। ললিতের ঠোঁটের ভুবন-ভোলানো হাসির তুফান ছাড়িয়ে যায় তাদেরও ঠোঁটের ডগায়। গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকারাও হাসে।

প্রায় তিরিশ বিঘার রঙিন ফুলের বন। ললিতদা এখানে আরণ্যক মায়ের স্নেহ-মমতা ঝরিয়ে লালন করে

চলেছে রঙের অরণ্য। জবা আর টগরের টানা বেড়া। আর তারই সমান্তরালে বিশল্যকরণী বৃত্তাকারে গিয়ে মিলেছে শ্বেত চন্দনের দুয়ারে। বোতলব্রাশ ফুল নুয়ে পড়ে মাটি ছুঁয়েছে। উত্তর-পুবের কোণ বরাবর বাঁক নিলে চোখে পড়বে সুন্দরী আর রুদ্রাক্ষ গাছ। সুন্দরবনের নোনা মাটির সুন্দরী লাল মাটির গভীরে শেকড় ছড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে আকাশে শাখা মেলেছে। ললিতদা দিন গুনছে কবে ওর শ্বাসমূল মাটিতে ডানা মেলবে, তা দেখার। টবে সারি সারি পাম। দূরে পাইন আর ধুপির সারি। পাশাপাশি আরকেরিয়ার মেলা। টবেতেই ফলছে আখরোট। সুদূর হিমালয়ের গাছ যে এই উষ্ণ বলয়ের ভয়ানক গরমের মাটিতেও ডানা মেলতে পারে ললিতদা তা প্রমাণ করেছে।

কিছু দূরে বত্রিশ রকমের ক্যাকটাস, কাঁটা-জড়ানো সবুজের বলয়গ্রাস। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, কেঁদ, আমলকী এমনকী বকুলেরও বনসাই। থিরথিরে বাতাসে দুলছে 'হাইনেক থুজা'। পাশাপাশি কাঁটাঝাউ-তে বুলবুলির বাসা। ক্যাসুরিনা আকাশ ছুঁতে চলেছে। ফি বছর বর্ষায় এখান থেকেই সরবরাহ হয় এক লক্ষ চারাগাছ। কাজু, সেগুন, মেহগিনি, দেওদার, জ্যাকারান্ডা, শাল, পিয়াল, মহুল, মহানিমের চারা কিনতে দূর-দূরান্তের মানুষ আসে এখানে। আসে গাছের টানে, আসে বনপাগলা ললিতের টানেও।

ভিতরেই বন-আবাসনের সামনে শালগম, গাজর, মুলো, নানা রকমের শাক, পালং, বেগুন আর টোম্যাটোর মেলা। হাসছে ফুলকপির কলি। বেনেবউ-জোড়া উড়ে যেতেই সেই ডালে এসে বসে একাজোড়া নীলকণ্ঠ বসন্ত। ওই তেজপাতা গাছেই বাসা বেঁধে নিশ্চিন্তে সংসার করেছে কয়েক জোড়া টুনটুনি। বকুল গাছের তলায় বাঁধানো চত্বরে বসে ইতিমধ্যেই তিন রাউন্ড চা সাবাড় করেছি। বউদি হুকুম জারি করেছেন লুচি হচ্ছে। না খেয়ে ওঠা যাবে না। কিছু দূরে মাচার ওপর বিশাল সবুজ লাউ, কুমড়ো, শশার প্রদর্শনী। কয়েক জন স্কুলের বাচ্চা সেগুলোকে নজর করছিল বহুক্ষণ ধরেই। ললিতদা ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে—"কী হে ছানাসকল, শশা দেখচু, লিবার মরদ নাই। যা, ছেঁড় গাছ থেকে। খা কেনে পেট ভরে। গাছ নষ্ট করবিস নাই।" বাচ্চাগুলো শশা ছিঁড়ে নিয়ে ছুট লাগায়।

ঘরে ফেরার পালা। গেট পার হয়ে রাঙামাটির রাস্তায় উঠে আসি। হাঁটছি উত্তরের শাল বনের দিকে। ললিতদা মিলিয়ে যাচ্ছে বনের সবুজে। অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামের আরণ্যক মানুষটি দু-হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে তার প্রভাতী অতিথিকে। ওর দু-হাত নড়ছে বনশিউলির ঝোপের মাথায়। আমার চশমার কাচে জমাট কুয়াশার আস্তরণ। সামনেও বই-খাতা কাঁধে কচিকাঁচাদের সবুজ মিছিল। দূরের স্কুলে বাজছে সকালের ছুটির ঘন্টা।

অরণ্য আছে, থাকবেও। শাশ্বত সবুজের বাণী। এদেরই কেউ হয়তো আরও তিরিশ বছর পরে কলম হাতে খুঁজে পাবে এরকমই কোনো যুগলপ্রসাদকে। ললিতরা হারায় না। নিঃশেষ হয়েও যায় না। যতই ভোগবাদের ধোঁয়াশা জমুক চার ধারে। ওরা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও।

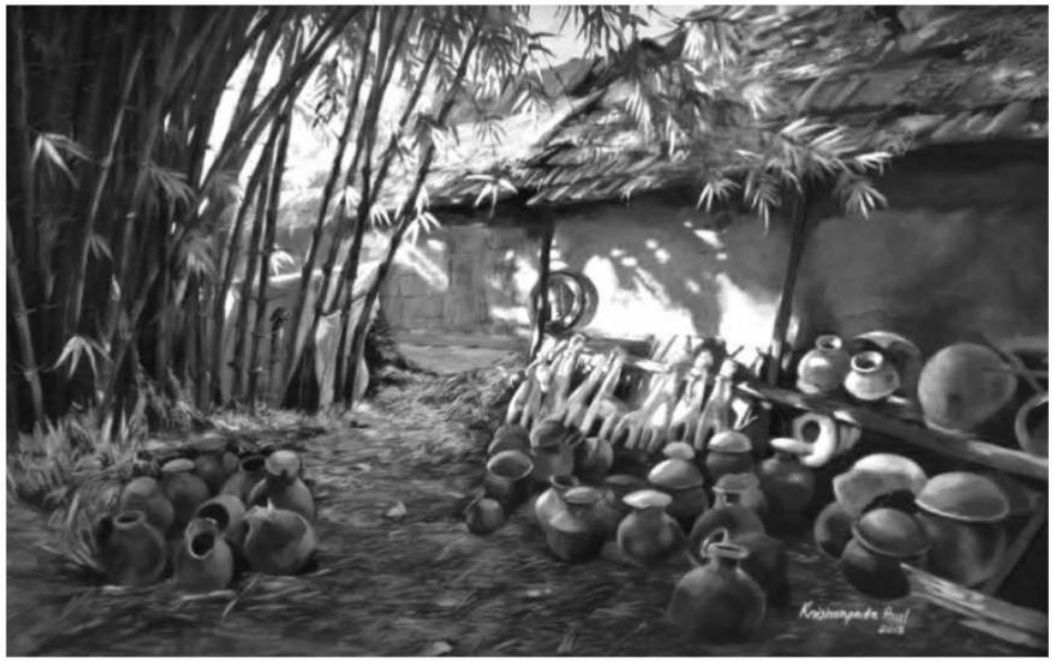

শিল্পী : কৃষ্ণপদ পাল

Title : The Evening Light

শিল্পী : পিঙ্কি ঘোষ

Title : The Nature-II

শিল্পী : সুমন বর্মন

Title : Portrait-I

শিল্পী : পার্থপ্রতিম তালুকদার

Title : Landscape

শিল্পী : শৈলেশ চ্যাটার্জী

Title : Outdoor

শিল্পী : সায়ন সামুই

Title : The Women

শিল্পী : সুদীপ্ত দাশগুপ্ত

Title : Wooden

শিল্পী : পার্থপ্রতিম তালুকদার

Title : The Smokey Night

শিল্পী : সুদীপ্ত দাশগুপ্ত

Title : Beauty of Lost

শিল্পী : কৃষ্ণপদ পাল

Title : Fishing